POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنۡقِمُ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنۡ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتۡنَا ؕ رَبَّنَاۤ اَفۡرِغۡ
عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّتَوَفَّنَا مُسۡلِمِيۡنَ ○

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 10

সংখ্যা 28

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 10 July, 2025 14 মহররম-1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সৎ ও অসৎ সঙ্গীর উপমা

২০৯৩) হযরত আবু মূসা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- সৎ সঙ্গী এবং অসৎ সঙ্গীর উপমা হল কস্তুরির (দোকান) এবং কামারের আগুনের ভাটা। যার উপমা কস্তুরীর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে তার কাছ থেকে তুমি (দুটির মধ্যে একটি অবশ্যই করবে) হয় তুমি সেটি ক্রয় করবে অথবা তার থেকে সুগন্ধি পাবে। আর কামারের জ্বলন্ত ভাটা হয় তোমার শরীর ও পরিধান পুড়িয়ে ফেলবে অথবা তার থেকে তুমি কেবল দুর্গন্ধ পাবে।

উপহার বিক্রি করা

২১০৪) হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) হযরত উমর (রা.) একটি রেশমের পোশাক বা রেশমের ডোরাকাটা পোশাক উপহার দিলে তিনি সেটি পরিধান করেন। আঁ হযরত (সা.) তাঁকে বলেন, আমি আপনাকে এটি পরিধান করার উদ্দেশ্যে দিই নি। এটা তো সেই ব্যক্তিই পরিধান করে যে পরকালের বরকত থেকে বঞ্চিত। আমি আপনাকে এটি একারণে পাঠিয়েছিলাম যাতে এটি থেকে আপনি উপকৃত হতে পারেন। অর্থাৎ বিক্রি করে দেন।

ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী নীতি

২১৫১) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) একটি মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা এর চামড়াকে কেন কাজে লাগাও না? তারা উত্তর দিল,এটা তো মৃত-জীব। তিনি (সা.) বললেন, কেবল সেটি ভক্ষন করা হারাম।

রসুল আকরম (সা.)-এর সাহাবাদের মধ্যে কেউ ধর্মচ্যুত হন নি। অন্যান্য নবীদের সাহাবাগণের মধ্য থেকে এমন সংখ্যা হাজার হাজার রয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

রসুলুল্লাহ্ (সা.) যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন মক্কার মানুষ এমন ছিল যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু, যে কিনা দুধের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। অর্থাৎ রবুবিয়্যতের মুখাপেক্ষী ছিল। তাদের জীবনযাপন ছিল পাশবিক। আঁ হযরত (সা.) তাদেরকে মায়ের মত দুধ পান করিয়ে তাদের লালন পালন করেছেন। অতঃপর রহমানিয়্যত-এর গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। সেই সমস্ত উপকরণ দেওয়া হয়েছে যেখানে (মানবিক) প্রয়াসের কোন দখল ছিল না। কুরআন করীমের ন্যায় নেয়ামত এবং রসুল করীম (সা.)-এর ন্যায় আদর্শ পুরুষ তাদের দেওয়া হয়েছে। অতঃপর রহীমিয়্যতের গুণেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যা চেষ্টা করা হয়েছে, তার পরিণাম পাওয়া গেছে। তাদের ঈমান গৃহীত হয়েছে এবং নাসারাদের ন্যায় তাদেরকে পথভ্রষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে; তাদেরকে (ঈমানে) অবিচল ও অটল রাখা হয়েছে। চেষ্টার মধ্যে এই বরকত রয়েছে, খোদা তা'লা এতে অবিচলতা দান করেন। রসুল আকরম (সা.)-এর সাহাবাদের মধ্যে থেকে কেউ ধর্মচ্যুত হন নি। অন্যান্য নবীদের সাহাবাগণের মধ্য থেকে এমন সংখ্যা হাজার হাজার রয়েছে। হযরত মসীহর শিষ্যদের মধ্য থেকে একই দিনে পাঁচশ শিষ্য তাঁকে ত্যাগ করে ধর্মচ্যুত হয়েছে। আর যাদের উপর তাঁর গভীর বিশ্বাস ও আস্থা ছিল, তাদের মধ্যে একজন ত্রিশ দিরহমের বিনিময়ে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল আর অন্যারা তাঁর প্রতি অভিসম্পাত করেছিল।

আসল কথা হল, প্রশিক্ষকের (আধ্যাত্মিক) শক্তির প্রভাব থাকে। প্রশিক্ষকের কথা যত বেশি শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ হবে, তার শিক্ষার প্রভাব তত বেশি দৃঢ় ও স্থায়ী হবে।

আমাদের নবী করীম (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি যে পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ এটা তার আরও একটা প্রমাণ। তাঁর প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত জামাতে এমন অবিচলতা ও দৃঢ়তা ছিল যে, তারা আঁ হযরত (সা.)-এর জন্য নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ পর্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হত না।আর মসীহর অসম্পূর্ণতার একটি স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, তিনি যে জামাত প্রস্তুত করেছিলেন, সেই জামাতই তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল, তাঁর প্রাণের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং পরিশেষে তারা তাঁকেই অভিসম্পাত করেছিল। বস্তুত, রসুল করীম (সা.)-এর রহিমিয়্যতের প্রভাবেই সাহাবাগণ দৃঢ়তা ও অবিচলতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ এর বাস্তবিক প্রদর্শন সাহাবাদের জীবনে এভাবে ঘটেছিল যে, খোদা তা'লা তাঁদের ও অন্যদের মাঝে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য গড়ে দেন। অর্থাৎ যে মারেফাত এবং খোদার ভালবাসা তাদেরকে এই পৃথিবীতে দেওয়া হয়েছে এটা তাদের জন্য এই জগতের প্রতিদান ছিল। (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭১-৭২)

সে নিজের সমস্ত ছিদ্রের হেফাজত করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ কান, চোখ, মুখ এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহেরও। তারা পরনিন্দা করেও না আবার শোনেও না, অপরের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেয় না, ব্যাভিচারও করে না।

সূরা হজ্জের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

অতঃপর মোমিন এর থেকেও উন্নতি করে এবং সেই পর্যায়ে পৌঁছায় যেখানে সে নিজের সমস্ত ছিদ্রের হেফাজত করতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ কান, চোখ, মুখ এবং নিজেদের লজ্জাস্থান সমূহেরও। তারা পরনিন্দা করেও না আবার শোনেও না, অপরের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেয় না, ব্যাভিচারও করে না। তবে নিজেদের স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বৈধ। অনুরূপভাবে এমন মহিলাদের সঙ্গে যাদের দক্ষিণ হস্তের তারা মালিক। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এমন লোকদের সঙ্গে সম্পর্কে দোষের কিছু নেই।

"দক্ষিণ হস্তের মালিক'-এর ব্যাখ্যায় একথা স্মরণ রাখা উচিত যে অনেকে বাড়ির পরিচারিকা বা কাজের মেয়েদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে। এবং কেউ কেউ সেই সমস্ত দাসীদেরকেও এর অন্তর্ভুক্ত করে যারা কোন দুর্বল জাতির অংশ, যাদের উপর আক্রমণ করে জোর করে মহিলাদের অপহরণ করে আনা হয়ে থাকে এবং বিক্রয় করে দেওয়া হয়। অনেকে আবার একথার এই অর্থও করে যে, যে- সমস্ত মহিলা জিহাদে লাভ হয়, তাদেরকে নিকাহ ছাড়া নিজেদের বাড়িতে রাখা বৈধ। কিন্তু এই সকল অর্থই ত্রুটিপূর্ণ। কুরআন করীম ও হাদীসে ভৃত্য ও দাসদের পৃথক পৃথক উল্লেখ রয়েছে। তাই ভৃত্য বা গৃহ পরিচারিকারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। আর ক্রীতদাসদের সম্পর্কে কুরআন করীমে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنۡ يَّكُوۡنَ لَهٗۤ اَسۡرٰى حَتّٰى يُثۡخِنَ فِى الۡاَرۡضِ অর্থাৎ কোন শান্তিপ্রিয় জাতির মধ্য থেকে পুরুষ যুদ্ধবন্দী অথবা মহিলা যুদ্ধবন্দী জোর করে ধরে আনা কোন নবীর জন্য বৈধ নয়, যতক্ষণ না তার এবং তার শত্রুদের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। অর্থাৎ অকারণে কোন জাতি থেকে, যারা যুদ্ধ থেকে বিরত আছে, বন্দী বানিয়ে নিয়ে আসা বৈধ নয়। যেভাবে শত শত বছর থেকে হিজাজ=এর লোকেরা হাবশা থেকে দাস ধরে নিয়ে আসত। যেভাবে গত শতাব্দীতে ইরাকের লোকেরা ইরান বা রোম বা গ্রীস বা ইতালির

এরপর ১১ পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

যেদিন আঁ হযরত (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করেন, আল্লাহ্ তা'লা সেই দিনই তাঁকে সুসংবাদ দান করেছিলেন,'তুমি দুঃখ করো না, একদিন আমি তোমাকে এই স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসব।'

গবেষকদের নিকট কুরআন করীমের এই ভবিষ্যদ্বাণী আঁ হযরত (সা.)-এর নবুয়তের একটি দলিল। কেননা আঁ হযরত (সা.)-এর খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অদৃশ্যের সংবাদ দিয়েছিলেন এবং এমনটিই সংঘটিত হয়েছিল যেমনটি তিনি সংবাদ দিয়েছিলেন।

যদি সকল ইসলামী যুদ্ধের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে যে, সেগুলির মধ্যে এক গভীর প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। বিশেষ করে, মক্কা বিজয়ের পূর্বের যতগুলি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মক্কা বিজয়ের পথ পরিস্কার করা।

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপটে আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনীর মহান অধ্যায়।

মাননীয় ডক্টর শেখ মহম্মদ মাহমুদ সাহেব শহীদের স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে শীঘ্রই পাকড়াও করুন এবং দেশকে বাঁচানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করাআবশ্যক। এখনই তাদের থেকে মুক্তি পাওয়া প্রয়োজন। কারণ এই তথাকথিত ধার্মিকরা, যারা আসলে সন্ত্রাসী, তারা ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ করছে। এই লোকেরা দেশকে ধ্বংস করতে তৎপর এবং সর্বত্র যারাই তাদের মতের বিরোধী প্রত্যেকের ওপর তারা আক্রমণ করে। যাহোক না কেন, আমাদের আকুতি তো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র কাছে এবং আমাদের উচিত তাঁর অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করার চেষ্টা করা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৩ শে মে, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (২৩ হিজরত, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,বিগত খুতবায় আমি এক ব্যক্তির সালাম দেওয়া সত্ত্বেও একজন মুসলমানের তাকে হত্যা করার (কথা) উল্লেখ করেছিলাম। আর এর বরাতে সূরা নিসার ৯৫ নাম্বার আয়াত পাঠ করেছিলাম, যাতে এটি উল্লেখ আছে, 'যদি তোমাদেরকে কেউ সালাম দেয় তাহলে তাকে এ কথা বোলো না যে, তুমি মু'মিন নও'। এর বিশদ বিবরণ সেখানে উল্লেখ করা হয় নি। বিস্তারিত বিবরণ হলো, আমি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখও করেছিলাম, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাকে বাঁধা দিয়েছিলেন কিন্তুএটিও উল্লেখ রয়েছে, তিনি (সা.) চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন এবং তাকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন। বরং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে, তিনি (সা.) তার বিরুদ্ধে (বদ্)দোয়া করেছিলেন। যাহোক, উক্ত ঘটনায় তিনি (সা.) গভীর দুঃখ পেয়েছিলেন, কারণ উক্ত নিহত ব্যক্তির কিসাসের (বা প্রতিশোধের) বিষয়টি হুনায়নের যুদ্ধের পর (নিহতের) আত্মীয়স্বজনদের পক্ষ থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এ কারণে এর বিশদ বিবরণ সে-ই সময় উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্ । যাহোক, মহানবী (সা.) এটিকে খুবই জঘন্য অপরাধ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। হায়! বর্ত মানে পাকিস্তানের তথাকথিত ধর্মের ঠিকাদার মোল্লারা যদি এই বিষয়টি বুঝতে পারতো! আর আহমদীদের ওপর তারা যে অত্যাচার করছে, তারা যদি এথেকে বিরত হতো, তাহলে তারা আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা পেত।

যাহোক, বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের যে বিবরণ চলছে তার সূত্রে মক্কা-বিজয়ের উল্লেখ করবো, যেটি অষ্টম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধকে ফাত্ হে আযীম (বা মহান বিজয়)ও বলা হয়। যেমনটি আমি বলেছি, এই যুদ্ধ অষ্টম হিজরীর রমযান (মাসে) সংঘটিত হয়েছিল। এটি ছিল সেই সুমহান বিজয়, যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তা'লা পূর্বেই দিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে দলে দলে মানুষ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছিল।

(সূত্র: শারাহ যুরকানি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৮৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বেইরুত)
(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) পবিত্র কুরআনের বরাতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৮১) অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, হে আমার প্রতিপালক-প্রভু! আমাকে এই শহর অর্থাৎ মক্কায় সত্যনিষ্ঠভাবে প্রবেশ করিও (অর্থাৎ হিজরতের পর বিজয় ও সফলতা দান করে এবং এই শহর থেকে উত্তমভাবে বের করো (অর্থাৎ হিজরতের সময়)। আর নিজ সন্নিধান থেকে আমাকে বিজয় এবং সাহায্যের উপকরণ প্রেরণ করো। এটি সেই আয়াত যা হিজরতের পূর্বে সূরা বনী ইসরাঈলে তাঁর (সা.) প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল আর যেখানে হিজরত এবং পরবতীতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল।

(দিবাচা তফসীরুল কবীর, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৪৬)

সূরা ফাতাহ্ 'তে মক্কা-বিজয়ের সুসংবাদ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ:
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَ اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا

(সূরা আল্ ফাতহ্: ১৯) অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার বয়আত করছিল। তাদের হৃদয়ে যা ছিল- সে বিষয়ে তিনি ভালোভাবে অবগত। অতএব, তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন এবং একটি মহান বিজয় দান করেন।

প্রকৃত বিষয় হলো, মহানবী (সা.) যেদিন মক্কা থেকে হিজরত করেন সে-দিনই আল্লাহ্ তঁ াকে এই সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, তুমি দুঃখিত হয়ো না, একদিন আমি তোমাকে এই জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

অতএব, হিজরতের সময়ও এই আয়াত অবতীর্ণ হবার উল্লেখ পাওয়া যায়। اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ - অর্থাৎ, নিশ্চয় সেই সত্তা! যিনি তোমার ওপর এই কুরআনকে ফরয করেছেন, তোমাকে অবশ্যই এক প্রত্যাবর্তনস্থলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।

(সূরা আল্ কাসাস: ৮৬)

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহ.) এই আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করেন 'এই আয়াতে 'মা'আদ' তথা প্রত্যাবর্তনস্থল বলতে মক্কাকে বুঝানো হয়েছে আর এর কারণ হলো, এর মাধ্যমে মক্কা-বিজয়ের দিন মহানবী (সা.)-এর মক্কায় প্রত্যাবর্তন বোঝানো হয়েছে।' এক রেওয়ায়েতে আছে, হিজরতের সময় মহানবী (সা.) যখন মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলেন তখন তিনি (সা.) মক্কার প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেন । তখন হযরত

জিব্রাঈল (আ.) অবতীর্ণ হন এবং বলেন, (হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি আপনার স্বদেশ ও জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন? তিনি (সা.) বলেন, জ্বি । তখন জিব্রাঈল (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন, إِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ (অর্থাৎ) নিশ্চয় সেই সত্তা! যিনি তোমার ওপর এই কুরআনকে ফরয করেছেন, তোমাকে অবশ্যই এক প্রত্যাবর্তনস্থলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। অর্থাৎ, কুরাইশের ওপর বিজয় দান করে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন। কেননা মহানবী (সা.) প্রথমে মক্কায় ছিলেন এরপর তা ত্যাগ করেন এবং পুনরায় সেখানে ফিরে আসেন। আর মক্কা ছাড়া এই বিষয়টি অন্য কোনো স্থানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হতে পারে না।

গবেষকদের মতে পবিত্র কুরআনের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী মহানবী (সা.)-এর সত্য নবী হবার প্রমাণ বহন করে, কেননা তিনি (সা.) খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদান করেছেন আর তিনি (সা.) যেভাবে বলেছিলেন ঠিক সেভাবেই তা ঘটেছিল।

(সূত্র: আততফসীরুল কবীর, রাজি, খণ্ড-১৩, ভাগ-২৫, পৃ: ১৯)

পবিত্র কুরআনের অন্য একটি স্থানেও মক্কা-বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, যেখানে মহানবী (সা.)সহ সকল মুসলমানকে যেন এটি স্মরণও করানো হয় যে, 'দেখো! তোমরা যেখানেই যাও না কেন এ কথা ভুলে যেয়ো না যে, অবশেষে মক্কা বিজয় হবে, আর এর জন্য তোমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, পরিশ্রম এবং দোয়াও করতে হবে। আর কুরআনের এই ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, মহানবী (সা.)-এর তখন পর্যন্ত পরিচালিত সকল যুদ্ধ ও সমরাভিযানের একটি উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্য মক্কা বিজয়ও ছিল।

যেমন, পবিত্র কুরআনের এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ । সুরা বাকারার উক্ত আয়াতের তফসীরে হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন- ***'ওয়া মান হাইসু খারাজতা'*** - এর অর্থ তফসীরকারকগণ এটি করেছেন যে, 'তুমি যেখানেই থাকো না কেন সর্বাবস্থায় মসজিদে হারামকে নিজের কিবলা হিসাবে নির্ধারণ করো আর এর কারণ তারা এটি বলে থাকেন যে, প্রথম নির্দেশ দ্বারা এই ধারণা সৃষ্টি হতে পারত যে, এই কিবলা হয়ত শুধু মাত্র মদীনাবাসীদের জন্য; বাকী লোকদের জন্য নয়। এজন্য আল্লাহ্‌ তা'লা বলে দিয়েছেন, তোমরা যেখান থেকেই বের হও বা যাত্রা করো না কেন নিজের মুখ মসজিদে হারামের প্রতি নিবদ্ধ রাখো। তিনি (রা.) বলেন, কিন্তু প্রকৃত বিষয় হলো, এই আয়াতে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে সম্বোধন করা হোক বা সকল মুসলমানকে (হোক); কি বলার দিকে মুখ করার অর্থ হতেই পারে না। এর প্রথম কারণ হলো, যে নামায কোনো শহরে বা গ্রামে অবস্থানকালীন আদায় করা হয় তা শহর থেকে বের হওয়ার সময় আদায়কৃত নামাযের থেকে স্বভাবতই বেশি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় নির্দেশ তো সেটি দেওয়া উচিত ছিল, যেখানে বেশি নামায আদায় করার বিষয়টি প্রযোজ্য, এমন নির্দেশ দেবার কথা নয় যার ওপর সফরকালীন অবস্থায় আমল করার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। উদাহরণস্বরূপ, হতে পারে কোনো ব্যক্তি সকাল দশটায় শহর থেকে বের হয় বা আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে যাত্রা করে বা মাঝরাতে বের হয় আর এসব সময় এমন নামাযের কোনো প্রশ্নই আসে না। এমতাবস্থায় وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -এর নির্দেশ নিরর্থক সাব্যস্ত হয়। কারণ কোনো শহর ত্যাগ করার সময় কদাচিৎ-ই হয়ত কোনো নামাযের সময় হয়ে থাকে। সাধারণত মানুষ হয়ত সে-সময়ের পূর্বেই নামায পড়ে ফেলেন আর যদি নাও পড়ে থাকেন তাহলে কিছু সময় পরে সেই নামায পড়তে পারেন। যাহোক, যাত্রা বা বের হওয়ার সাথে নামাযের কোনো সম্পর্ক নেই। এছাড়া এসব অর্থকে এ অবস্থাতেও সঠিক বলে মেনে নেওয়া যেতো যদি যাত্রার সাথে কোনো নামায বিশেষভাবে সম্পর্ক রাখতো কিন্তু সবাই এ কথা জানে যে, কোনো নামাযই যাত্রাকালীন সময়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়।এমতাবস্থায় এই আয়াতকে ইচ্ছাকৃতভাবে সফরে ঘর থেকে বের হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না। এই বিষয়টির আরো প্রমাণ এই যে, 'মিন হাইসু খারাজতা' দ্বারা নামাজে কিবলার দিকে মুখ করা উদ্দেশ্য নয়, কারণ সফরের অবস্থায় তো কখনো কখনো দিকের প্রশ্নই থাকে না এবং যেদিকে মুখ থাকে সেদিকেই নামাজ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ মানুষ যখন বাহন থেকে নামতে পারে না তখন কুরআন করীম এবং মহানবী (সা.)-এর আমল থেকে এটাই প্রমাণিত যে, সে সময় যেদিকে তার মুখ থাকে সেদিকেই নামাজ জায়েয। সফরে নামায পড়ার সময় যেদিকে মুখ আছে সেদিকেই নামাজ জায়েজ, তা কেবলার দিকে মুখ হোক বা অন্য কোনো দিকে হোক। সে সময় দিকের কোনো প্রশ্ন উঠে না। পূর্ব , পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব সমান হয়ে যায়। শুধুমাত্র আন্তরিক মনোযোগ কাবা ঘরের দিকে থাকা প্রয়োজন।অর্থাৎ নামাজ পড়ার সময় শুধু এই খেয়াল রাখতে হবে যে, আমার মনোযোগ যেন কাবা ঘরের দিকে থাকে। আজকাল মানুষ যখন রেলগাড়িতে বসা থাকে তখনও দিকের কোনো নির্দিষ্টতা থাকে না, কারণ গাড়ি কখনো উত্তর দিকে, কখনো দক্ষিণ দিকে, কখনো পূর্ব দিকে, আর কখনো পশ্চিম দিকে ঘুরতে এবং প্রদক্ষিণ করতে থাকে। একইভাবে জাহাজের সফরে, যেগুলো দীর্ঘ সফর, সেগুলোতেও আমরা (তা-ই) দেখি। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এতে বসে নামাজ পড়ে তার নামাজে কোনো বিঘ্ন ঘটে না। যদি মুফাস্‌সেরদের অর্থকে সঠিক বলে ধরা হয় তাহলে এই নির্দেশের উপর না আরোহী আমল করতে পারবে আর না রেলগাড়িতে বসা ব্যক্তি আমল করতে পারবে। সুতরাং যেখানে খুরুজ বা বের হবার সময় কোনো দিকের নির্দিষ্টতাও বজায় থাকে না সেখানে এই আয়াত থেকে এই অর্থ গ্রহণ করা যে, যেখান থেকেই তোমরা বের হও কাবা ঘরের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ো তা কীভাবে সঠিক হতে পারে!

অতঃপর এই অর্থ এই কারণেও সঠিক নয় যে, এই আয়াতের আভিধানিক অর্থ এই হয় যে, তোমরা যেখান থেকেই বের হও তোমাদের মুখ মসজিদুল হারামের দিকে করে নাও। অথবা তুমি যেখান থেকেই বের হও তুমি তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে করে নাও। এখন এটা প্রত্যেক ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, হেঁটে চলা অবস্থায় নামাজ পড়া যায় না, বরং নামাজ থেমে দাঁড়িয়েই পড়তে হয়। হ্যাঁ, যদি এই আয়াতে এই শব্দগুলো থাকত যে , حَيْثُ مَا كُنْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ, তুমি যেখানেই থাকো তোমার মুখ মসজিদুল হারামের দিকে করে নাও, তাহলে এই অর্থ সঠিক হতে পারত, কিন্তু এখানে তো এটি বলা হয়েছে যে, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)! অথবা হে মুসলমানগণ! যেখান থেকেই তোমরা বের হও, তোমাদের মুখ মসজিদুল হারামের দিকে করে নাও। এখন এটা স্পষ্ট কথা যে, বের হবার সময় নামাজ পড়া হয় না, বরং কোনো স্থানে অবস্থান করে নামাজ পড়া হয়। সুতরাং বোঝা গেল যে, এখানে নামাজ পড়ার অর্থ করা কোনো অবস্থাতেই সঠিক নয়। মুফাস্‌সেরগণ বলেন যে, যদি নামাজ এবং খুরুজের সম্পর্ক স্বীকার না করা হয় তাহলে পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়, অথচ এটাও ভুল। তাদের কাছে কুরআন মজীদে পুনরাবৃত্তি শুধুমাত্র এই কারণে দেখা যায় যে, তারা কুরআন করীমের সঠিক অর্থ এবং বিষয়বস্তুর পরস্পরিক সম্পর্ক বুঝতে পারেননি। তারা যেখানেই কোনো আপত্তি দেখেন সাথে সাথে নাসেখ ও মানসূখের (রহিতকারী ও রহিত) আলোচনা শুরু করে দেন এবং একটি আয়াতকে নাসেখ ও অন্যটিকে মানসূখ ঘোষণা করে আপত্তি থেকে মুক্তি পেয়ে যান। যদিও কুরআন করীমের যেসব সত্য হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) জগদ্বাসীকে জানিয়েছেন সেগুলো যদি বিবেচনায় রাখা হয় তাহলে না কুরআন করীমে কোনো পুনরাবৃত্তি দেখা যেতে পারে আর না কোনো আয়াতকে মানসূখ ঘোষণা করতে হয়। আসল বিষয় এই যে, মহানবী (সা.)-কে যখন মক্কা মুকাররমা থেকে বের করে দেওয়া হয় তখন ইসলামের শত্রুদের এই আপত্তি করার সুযোগ লাভ হয় যে, আপনি যদি দোয়ায়ে ইবরাহীমীর সত্যায়নস্থল হয়ে থাকেন এবং কাবা ঘরের সাথে আপনার সম্পর্ক থাকে তাহলে আপনাকে মক্কা থেকে কেন বের করে দেওয়া হলো? আর যখন আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি দোয়ায়ে ইবরাহীমীর সত্যায়নস্থল কীভাবে হতে পারেন- এটা হলো প্রশ্ন। এই আপত্তির উত্তরে আল্লাহ তা'লা বলেন, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ অর্থাৎ, হে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)! তোমার মক্কা থেকে এই বের হওয়া সাময়িক, আমরা তোমার সাথে এই ওয়াদা করছি যে, আমরা পুনরায় তোমাকে এই সুযোগ দেব এবং তুমি মক্কার উপর অধিকার লাভ করবে। কিন্তু যেখানে আল্লাহ তা'লার মু'মিন বান্দাদের সাথে এরূপ ওয়াদা হয় সেখানে তিনি তাদের কাছে এই আশাও করেন যে, তারা এই ওয়াদা পূরণের চেষ্টা করবে। এমন নয় যে, খোদা তাদের সাথে ওয়াদা করবেন আর তারা হাতের উপর হাত রেখে বসে থাকবে এবং সেই ওয়াদা পূরণের চেষ্টা করবে না এবং এটা ভেবে নেবে যে, যেহেতু আল্লাহ তা'লা ওয়াদা করেছেন তাই তিনি নিজেই তা পূরণ

মহান আল্লাহর বাণী

এবং লোকদের মধ্যে কতক এমন আছে যাহারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া দেয়, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ এইরূপ বান্দাগণের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল। (আল-বাকারা: ২০৮)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

করবেন, আমাদের তা পূরণ করার কী প্রয়োজন। অর্থাৎ তারা একথা ভাবতে আরম্ভ করবে (এমনটি হওয়া উচিত নয়)। হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায়ের সাথে আল্লাহ তা'লা ওয়াদা করেছিলেন যে, তাদেরকে কেনান দেশ দেওয়া হবে। হযরত মূসা (আ.) তার সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে যাত্রা করেন। যখন সেই দেশ সামনে চলে আসে তখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেন যে, যাও এবং যুদ্ধ করে এই দেশের উপর দখল নাও। হযরত মূসা (আ.)-এর সম্প্রদায় ভুলবশত এই ধারণা করে নেয় যে, আল্লাহ তা'লা এই দেশ আমাদের দেওয়ার ওয়াদা করেছেন তাই তিনি নিজেই এই ওয়াদা পূরণ করবেন এবং এই দেশ আমাদের দখলে এনে দেবেন। আমরা যদি এই দেশ বিজয় করি তাহলে ওয়াদার কী লাভ হলো। ওয়াদা তো খোদা করেছেন, তাই তিনি নিজেই তা পূরণ করুন। আমাদের এর জন্য কোনো প্রকার চেষ্টার প্রয়োজন নেই। অতএব তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলে দেয় যে, اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ অর্থাৎ, হে মূসা! তুমি আমাদের বলতে যে, এই দেশ আল্লাহ তা'লা তোমাদের দিয়ে দেবেন। এখন সমস্ত দায়িত্ব তোমার উপর অথবা তোমার খোদার উপর। আমরা যদি দেশ জয় করি তাহলে তোমার এবং তোমার খোদার ওয়াদার কী লাভ? যেহেতু তুমি আমাদের বলতে যে, আল্লাহ তা'লার এই ওয়াদা রয়েছে যে, এই দেশ আমাদের অবশ্যই অর্জিত হবে, তাই এখন তুমি এবং তোমার প্রভু দুজনেই গিয়ে যুদ্ধ করো। আমরা এখানে বসে আছি, আমরা কিছু করব না। যখন তোমরা দেশ বিজয় করে আমাদের দিয়ে দেবে, তখন আমরা তাতে প্রবেশ করব।এখন বাহ্যত তাদের কথা সঠিক মনে হয় যে, যদি কোনো ব্যক্তি কারো সাথে বলে যে, আমি তোমাকে অমুক জিনিস দেবো এবং সে তার কাছে এসে সেই জিনিস চায় আর সে উত্তরে বলে দেয় যে, যাও বাজার থেকে কিনে নাও, তখন সবাই এটাই বলবে যে, যদি তাকে সেই জিনিস বাজার থেকেই কিনতে হয় তো তার সাথে ওয়াদা করার কী প্রয়োজন ছিল! সুতরাং বাহ্যত এই কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, কিন্তু ইলাহী (স্বগীয়) বিষয়াদিতে এটা প্রথম শ্রেণীর অযৌক্তিক কথা। অতএব আল্লাহ তা'লা বনী ইসরাঈলের প্রশংসা করেননি, তিনি এটি বলেননি যে, তোমাদের যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই, এটা আমাদের দায়িত্বে যে, আমরা এই দেশ নিয়ে তোমাদের দেবো। বরং আল্লাহ তা'লা বলেন, তোমরা আমাদের অপমান করেছ, তাই তোমাদের এই দেশ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। যাও! চল্লিশ বছর পর্যন্ত জঙ্গলে ঘুরে বেড়াও। তোমরা এই দেশের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না, তোমাদের নতুন প্রজন্ম এই দেশের উত্তরাধিকারী হবে , কারণ তোমরা আমাদের অপমান করেছ। তোমরা দেখো যে, এই বিষয়টি মানবিক দিক থেকে সঠিক এবং যুক্তিসঙ্গত বলা যেতে পারে, কিন্তু ঐশী বিষয়ের দিক থেকে এটি একান্ত অযৌক্তিক এবং মানুষকে শাস্তিযোগ্য করে তোলে। এর কারণ এই যে, যখন কোনো মানুষ ওয়াদা করে তখন তার আকাশ ও পৃথিবীর পরিবর্তনের উপর কর্তৃত্ব থাকে না, অর্থাৎ ঐশী ও পার্থিব পরিবর্তনগুলোর উপর কর্তৃত্ব থাকে না, তাই যখন সে ওয়াদা করে তখন এমন বস্তুর ওয়াদা করে যা তার ক্ষমতার মধ্যে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে যে ওয়াদা হবে তার এই অর্থ হবে যে, যদিও এই বস্তুর অর্জন তোমাদের জন্য অসম্ভব তবুও এটা তোমাদের আমাদের সাহায্যে অর্জিত হবে।

যে জাতি শত শত বছর পর্যন্ত ফেরাউনের দাস ছিল, তার জন্য ইট বানাত, কাঠ কাটত এবং নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্ট কাজ করত, তারা এত বড় মহিমান্বিত দেশের উপর, যার উপর আদ জাতি শাসক ছিল, কীভাবে দখল নিতে পারত! তাদের এই দেশ পাওয়া সহজ ছিল না, কিন্তু খোদা বলেছেন যে, যদিও দেশ অর্জন করা তোমাদের কাছে অসম্ভব মনে হয়, কিন্তু আমরা এই ওয়াদা করছি যে, আমরা এই দেশ তোমাদের দেবো এবং তোমরা এই দেশ আমাদের সাহায্যে অর্জন করবে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতির অর্থ এই নয়, তিনি যেহেতু প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিয়েছেন তাই বান্দার চেষ্টাপ্রচেষ্টা করার প্রয়োজন নেই; বরং এর অর্থ এটি হয়ে থাকে, তোমরা যখন এটি অর্জন করতে সচেষ্ট হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সাহায্য করবেন আর তোমরা সফল হবে। যদিও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি ভিন্ন হয় এবং বান্দার অঙ্গীকার ভিন্ন হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লার যে-সব প্রতিশ্রুতির মাঝে চেষ্টাপ্রচেষ্টা অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেগুলোর ক্ষেত্রে বান্দাকে ভূমিকা পালন করতে হয় এবং সেগুলোকে পূর্ণ করার জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা করতে হয়। বান্দা যদি সেগুলোতে ভূমিকা পালন না করে এবং সেগুলো পূর্ণ করার চেষ্টা না করে তাহলে সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে বান্দার অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। বান্দা এটি বলতে পারে না যে, আমি তোমার জন্য খোদার তকদীর পরিবর্তন করে দেবো, কেননা এটি তার এক্তিয়ারে নেই। সে যদি এমনটি বলে তাহলে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করব, তুমি তকদীর পরিবর্তন করার কে? পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'লা এটি বলতে পারেন, তুমি যদি এমন করো তাহলে আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমার আদেশানুযায়ী যদি চেষ্টাপ্রচেষ্টা করো তাহলে আমি তকদীর বদলে দেবে, কেননা তকদীর এমন জিনিস যা তাঁর আয়ত্তাধীন আর তিনি যখন চান তা পরিবর্তন করতে পারেন। মহানবী (সা.)-কে যখন মক্কা-বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় তখন পাশাপাশি এটিও বলে দেওয়া হয়, হে মুসলমানেরা! তোমরা মূসা (আ.)-এর জাতির ন্যায় একটি মনে কোরো না, যেহেতু আল্লাহ্ মক্কা দিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করেছেন তাই তিনি নিজেই এটি পূর্ণ করবেন। আমাদেরকে কোনো চেষ্টাপ্রচেষ্টা করার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরকেও এটি পূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে।

আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতির অর্থ হলো, তোমরা দুর্বল, তোমরা যদি দুর্বল না হতে তাহলে মক্কা ছেড়ে কেন আসলে? মক্কা ছেড়ে আসার অর্থই ছিল তোমরা দুর্বল এবং তোমাদের শত্রুরা সবল ও শক্তিশালী, কিন্তু খোদা তা'লা শক্তি প্রদান করবেন আর তোমরা শত্রুর নিকট থেকে মক্কা ছিনিয়ে নেবে। অতএব وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ-এর অর্থ হলো, তোমরা যেখান থেকেই বের হও, যে স্থ ান থেকেই যাত্রা করো তোমাদের উদ্দেশ্য এটিই হওয়া উচিত, আমরা মক্কা-বিজয় করবই। অতঃপর 'খুরূজ' শব্দের অর্থ 'সৈন্যাভিযান'ও হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় এ আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা যেখানেই সৈন্যাভিযান পরিচালনা করো, যে স্থানেই যুদ্ধের জন্য যাও- তোমরা পূর্বদিকেই রওয়ানা হও না কেন বা দক্ষিণ দিকে যাত্রা করো কিংবা পশ্চিমদিকে সামনে এগোও অথবা উত্তরদিকে অভিযান চালাও না কেন তোমাদের উদ্দেশ্য এটিই হওয়া উচিত, যেন তোমাদের এ যাত্রার ফলে মক্কা-বিজয়ের ভিত্তি রচনা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ- তোমরা যদি দক্ষিণদিকে শত্রুর ওপর আক্রমণ রচনা করতে চাও আর তোমরা জেনে যাও যে, এ দেশের পশ্চিমদিকে তাদের মিত্র অবস্থান করছে এবং তাদের সম্বন্ধে এ আশঙ্কা রয়েছে পাছে তারা পেছন থেকে আক্রমণ করে বসে, সেক্ষেত্রে তোমরা প্রথমে পশ্চিমদিকে আক্রমণ করে তাদেরকে ধ্বংস করো। এর অর্থ দাঁড়াবে, পশ্চিমদিকে আক্রমণ মূলত দক্ষিণদিকে আক্রমণেরই প্রারম্ভ। একইভাবে এই জাতির সহচররা যদি উত্তরদিকে বসবাস করে আর তোমরা যদি প্রথমে তাদের ওপর আক্রমণ করো তাহলে এ আক্রমণ মূলত দক্ষিণদিকেই হবে, কেননা তোমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকবে দক্ষিণদিকের শত্রুদের ওপর আক্রমণ করা। এই মৌলিক বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত প্রদান করেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে মুসলমানেরা! তোমরা যে জাতি, দেশ এবং অঞ্চলের ওপরই আক্রমণ করো না কেন তোমাদের দৃষ্টি মক্কার প্রতিই নিবদ্ধ থাকা উচিত, কেননা আল্লাহ্ তা'লা এর বিজয় তোমাদের হাতে করতে চান। অতএব মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধসমূহের প্রতি আমরা দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই, সেগুলোর মাঝে এ দৃশ্য স্পষ্ট দৃষ্টিপটে আসে আর তাঁর (সা.) সকল যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মক্কা-বিজয়। যে যুদ্ধে তিনি (সা.) এ উদ্দেশ্য বিফল হতে দেখতেন কিংবা যে জাতি সম্বন্ধে তিনি (সা.) এটি অনুভব করতেন যে, তাদের সাথে যুদ্ধের কারণে মক্কা-বিজয়ে বিলম্ব হবে, সেক্ষেত্রে উসকানো সত্ত্বেও তিনি (সা.) নীরব থাকতেন এবং এড়িয়ে যেতেন। সর্বোপরি অনেক জাতি মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং উত্যক্তও করেছিল, কিন্তু তিনি (সা.) সর্বদা উপেক্ষা করেছেন। তবে যখন এমন কোনো জাতি দাঁড়াতো যাকে পরাজিত করার মাধ্যমে মক্কা-বিজয় সম্ভব হতো তখন তাদের সাথে তিনি (সা.) অবশ্যই যুদ্ধ করেছেন। ইসলামের সকল যুদ্ধের দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া হয় তাহলে বুঝা যাবে, সেগুলো নিজের মাঝে এক প্রজ্ঞাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ধারণ করত। বিশেষভাবে মক্কা-বিজয়ের পূর্বে যে-সব যুদ্ধ হয়েছিল সেগুলোর উদ্দেশ্য কেবল এটিই ছিল যেন মক্কা-বিজয়ের পথ পরিষ্কার হয়।

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From- Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

মহান আল্লাহ্র বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার। (আলে ইমরান: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azizur Rahaman Sb, Lalbag, Murshidabad

যদি এই আয়াতের এ অর্থ হতো যে, তোমরা যেখান থেকেই বের হও, কিবলার দিকে তোমাদের মুখ ফেরাও, তাহলে যেমনটি বলা হয়েছে, ***'মিন হাইসু খারাজতা'*** অর্থাৎ, যেখান থেকেই বের হও, এই শব্দগুলো এই আয়াতে থাকত না, বরং এই শব্দগুলোর পরিবর্তে এই শব্দগুলো থাকত যে, তোমরা যেখানেই থাকো, কিবলার দিকে তোমাদের মুখ রাখো। কিবলার দিকে মুখ ফেরানোর জন্য 'যেখানেই' শব্দগুলো থাকা উচিত ছিল, এটা নয় যে, তোমরা যেখান থেকেই বের হও, কিবলার দিকে তোমাদের মুখ ফেরাও। কারণ লোকেরা কোথাও থেকে বের হ বার সময় নামায পড়ে না। বের হবার সময় তো লোকেরা চলতে থাকে। সুতরাং নামায আদায়ের সাথে এই আয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং এই আয়াতের অর্থ কেবল এই যে, তোমরা যেখান থেকেই বের হও– তোমরা যদি এমন স্থান থেকে বের হও যার মুখ পূর্বদিকে বা এমন স্থান থেকে বের হও যার মুখ পশ্চিমদিকে, তোমরা যদি এমন স্থান থেকে বের হও যার মুখ উত্তরদিকে বা এমন স্থান থেকে বের হও যার মুখ দক্ষিণদিকে, যা-ই হোক না কেন, তোমাদের মুখ মক্কার দিকে থাকা উচিত। অর্থাৎ তোমাদের মনোযোগ, তোমাদের চিন্তা এবং তোমাদের মস্তিষ্ক কেবল এই বিষয়ের দিকেই নিবদ্ধ থাকা উচিত যে, তোমাদের মক্কা-বিজয় করতে হবে এবং সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে সমগ্র আরবকে করায়ত্তে আনতে হবে।

'উজুহ' শব্দের অর্থ 'তাওয়াজ্জুহাত' তথা মনোযোগসমূহ-ও হয়। সুতরাং এর অর্থ এই যে, তোমাদের একটিই উদ্দেশ্য থাকা উচিত যে, তোমাদের কাবাঘর বিজয় করে সেটিকে ইসলামের কেন্দ্র বানাতে হবে। কারণ যতক্ষণ না মক্কায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছে, যতক্ষণ না মক্কা মুসলমানদের অধীনে আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বাকি সমগ্র আরব মুসলমান হতে পারে না। এটাই ছিল সেই কর্মসূচি যা মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই কর্মসূচি তাদের শক্তির তুলনায় অনেক উর্ধ্বে ছিল। নিশ্চয় আরবের সরকার কোনো সুসংগঠিত সরকার ছিল না, কিন্তু সেখানে রাজতন্ত্রও ছিল না। বিভিন্ন বাদশার সাথে সম্পর্ক রাখত এবং চুক্তি ইত্যাদি করত। একইভাবে মক্কা যদিও পুরোপুরি সুসংগঠিত ছিল না, কিন্তু যা-ই হোক সেটা এমন একটি দেশের রাজধানী ছিল যার জনসংখ্যা পনেরো-বিশ লক্ষ পর্যন্ত ছিল। আশপাশের সমস্ত গোত্রের দৃষ্টি এর দিকে উত্থিত হতো এবং তারা এর সিদ্ধান্ত ও আদেশসমূহকে আনুগত্যের যোগ্য মনে করত। তারপর সেই যুগের হিসাবে সেটা অত্যন্ত বড়ো একটিশহর ছিল, পনেরো-ষোলো হাজার ছিল এর জনসংখ্যা। আর শুধু এর সমস্ত জনসংখ্যাই নয়, বরং দেশব্যাপী পনেরো-বিশ লক্ষ লোক সবাই সৈনিক ছিল। যুদ্ধবিদ্যায় অত্যন্ত দক্ষতা রাখত। যোদ্ধা, বীর এবং লড়াকু ছিল এবং মুসলমানদের জন্য তাদের মোকাবিলা করা কোনো সহজ কাজ ছিল না। যে সময়ে এই আয়াত রসূল করীম (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল, সেসময় মুসলমানদের মধ্যে কেবল চার-পাঁচশ সৈনিক ছিল, বেশি হলে এক হাজার ধরে নাও। আর নারী ও শিশু ইত্যাদি মিলিয়ে তাদের মোট সংখ্যা হবে এগারো-বারো হাজার। এর চেয়ে বেশি মুসলমানদের সংখ্যা ছিল না এবং তাদের যুদ্ধ শক্তি তো মোটেও উল্লেখযোগ্য ছিল না, কিন্তু এমন অবস্থায় যখন মুসলমানরা অত্যন্ত দুর্বল ছিল, যখন তাদের সংখ্যা কাফিরদের তুলনায় কোনো অনুপাতই রাখত না, যখন তাদের কাছে যুদ্ধের কোনো সামগ্রী ছিল না এবং যখন তাদের যুদ্ধ শক্তি কাফিরদের তুলনায় কোনো মূল্যই রাখত না, আল্লাহ তা'লা কাফিরদের চ্যালেঞ্জ দেন, এই মুসলমানরা যদিও তোমাদের কাছে অল্প মনে হয়, তোমাদের কাছে দুর্বল ও শক্তিহীন দেখায়, কিন্তু এই মুসলমানরাই একদিন তোমাদের দেশ জয় করবে, তোমাদের রাজধানী দখল করবে এবং সেখানে তাদের এতটা বিজয় লাভ হবে যে, তারা সেখানে ইসলামের বিধানসমূহ চালু করবে এবং কুফরকে আরবের ভূমি থেকে সম্পূর্ণ ধুলিসাৎ করে দেবে। এটা মুসলমানদের অবস্থার বিবেচনায় একটি উন্মাদনাপূর্ণ দাবি ছিল, অধিকন্তু এই দাবি এমন ছিল যা কোনো বিশেষ এলাকার সাথে সম্পৃক্ত ছিল না, বরং এই দাবির প্রভাব ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর ছিল,কেননা, এখানে শুধুমাত্র মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় নি , শুধুমাত্র আরবের ওপর বিজয় লাভের ঘোষণা দেওয়া হয় নি, বরং খ্রিষ্টধর্মকেও চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল, ইহুদী ধর্মকেও চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়ে ছিল, অগ্নিপূজা ধর্মকেও চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছিল এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যে, এই সমস্ত ধর্মকে পরাজিত করে ইসলাম সমগ্র পৃথিবীতে বিজয় লাভ করবে। এটি উম্মাদের প্রলাপের ন্যায় একটি দাবি ছিল। এজন্য কাফেররা মহানবী (সা.)-কে, নাউযুবিল্লাহ্, উম্মাদ বলত। সাহাবীদেরকেও উম্মাদ মনে করত, কেননা তারা এমন একটি দাবি করছিলেন যা পূর্ণ হওয়ার জন্য এই নশ্বর পৃথিবীতে কোনো জাগতিক উপকরণ তাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। তবে প্রকৃত বিষয় হলো, অবিস্মরণীয় কীর্তির জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত সকল মানুষের অভ্যন্তরে সেই অবস্থা সৃষ্টি না হবে, যাকে চিকিৎসা শাস্ত্রে 'মনোম্যানিয়া' বলা হয়, অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি বিষয়ের প্রতিই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখা, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বাকি সব উদ্দেশ্যকে ভুলে না যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মাঝে সর্বদা একটি উৎকণ্ঠা ও উদ্দীপনা পাওয়া না যাবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অসাধারণ কীর্তির জন্য তার ভিতর উম্মাদনার ন্যায় অবস্থা সৃষ্টি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই কর্মসমূহে কখনও সফলতা লাভ হতে পারে না। এদিকেই কুরআন মজীদ এই আয়াতে মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে, অন্য সমস্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভুলে যাও আর শুধুমাত্র এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নিজের সম্মুখে রাখ– 'আমরা মক্কাকে ইসলামের খাতিরে বিজয় করব'। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কেন্দ্র ও দুর্গ তোমরা লাভ করতে পারবে না সমস্ত আরব এবং সমগ্র পৃথিবীর ওপর তোমাদের বিজয় অর্জিত হবে না। এখানে এই প্রশ্ন জাগ্রত হয়, আল্লাহ্ তা'লা একথা কেন বলেছেন যে, "তোমরা যেখান থেকেই যাত্রা কর না কেন, নিজেদের দৃষ্টি বা মনোযোগ 'মসজিদে হারাম'-এর প্রতি রাখ"। এটি কেন বলেন নি যে, "তোমরা যে দিক থেকেই আক্রমণ রচনা কর না কেন নিজেদের দৃষ্টি বা মনোযোগ 'মসজিদে হারাম'-এর প্রতি রাখবে"। এর উত্তর হলো, যাত্রাকালেই এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে,আমাদের এই আক্রমণের উদ্দেশ্য কী? মানুষ প্রথমে যুদ্ধ শুরু করে পরে এর উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবে– এমনটি হয় না। অতএব, এখানে যেহেতু মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রাখার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য ছিল, এজন্য বলেছেন, 'তোমরা যাত্রার প্রাক্কালে এটি দেখে নাও, আমাদের এই যুদ্ধের ফলে মক্কা বিজয়ের ওপর কী প্রভাব পড়বে'। সেই যুদ্ধ যদি মক্কা বিজয়ের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ না হয় তবে তা পরিত্যাগ কর। তবে এর দ্বারা একথা মনে করা উচিত নয়, 'ইসলাম তার অনুসারীদের নিপীড়নমূলক যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করে'। কেননা ইতিহাস সাক্ষী, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই কাফেরদের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। এই বিষয়টিও স্মরণ রাখা উচিত, مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ (আয়াতে) শুধুমাত্র মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এর কারণ হলো, মহানবী (সা.)-এর পরে এভাবে মক্কা বিজয়ের অবশ্যকতা অবশিষ্ট থাকত না, কেননা তাঁর (সা.)-এর পর মক্কার ওপর কোনো আক্রমণ হওয়ার ছিল না, বরং সেটি পরিপূর্ণভাবে মুসলমানদেরই দখলে থাকার ছিল। যেন এখানে ভবিষ্যতের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, পবিত্র ও সম্মানিত মক্কাদ্বিতীয়বার বাহ্যিকভাবে বিজয় লাভ হবে না। কেননা মক্কার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠাকারী একটি সক্রিয় দল সৃষ্টি করা হবে এবং সেটি সবর্দা মুসলমানদের দখলে থাকবে।"

(তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১-১৮)

তাই সেখানে এ দিক দিয়েও যুদ্ধের অজুহাত শেষ হয়ে যায়। এই তফসির এবং ভূমিকা এ জন্য আবশ্যক ছিল, পরবতীতে মক্কা বিজয়ের ঘটনাবলি যা উল্লেখ করা হবে সেখানেও এই প্রেক্ষাপটে বুঝা সহজ হবে। বাকি ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তীতে উল্লেখ করব।

এখন আমি একজন শহীদের স্মৃতিচারণ করব। নামাযের পর তার জানাযাও পড়াব। তিনি হলেন সারগোদা নিবাসী শেখ মুবাশ্বের আহমদ দেহলভী সাহেবের পুত্র মুকাররম ডাক্তার শেখ মুহাম্মদ মাহমুদ সাহেব। তাকে আহমদীয়াতের শত্রুরা ১৬ই মে তারিখে গুলি করে শহীদ করেছে।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

বিশদ বিবরণে লেখা হয়েছে, ঘটনার দিন ডাক্তার সাহেব জুমুআর নামায আদায় করার পর নিজের পরিবারের সাথে ফতেমা হাসপাতাল সারগোধা, যেখানে তিনি প্রাক্টিস করতেন, পৌঁছান।হাসপাতালে ঢুকে প্রধান রিসিপশন কক্ষ অতিক্রম করে জরুরী বিভাগের সামনে করিডরে পৌঁছে নিজ কক্ষের দিকে যাচ্ছিলেন। সেখানে আগে থেকেই ওঁৎ পেতে থাকা একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তার পিছু পিছু আসে। সে শপিং ব্যাগ থেকে পিস্তল বের করে পিছন থেকে গুলি করে। ডাক্তার সাহেবের শরীরে দুটি গুলি লাগে যা শরীর

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্‌কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

ভেদ করে বের হয়ে যায়। দ্রুত তাকে সিভিল হাসপাতালে নেওয়া হয় কিন্তু আঘাতের তীব্রতায় মোকাররম ডাক্তার সাহেব শহীদ হয়ে যান اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْن। ঘটনার পর আক্রমণকারী অস্ত্র উঁচিয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে বাহিরে দাঁড়ানো নিজ সাথীদের সাথে মোটরসাইকেলে চড়ে পালিয়ে যায়। শাহাদাতের সময় মরহুমের বয়স ছিল ঊনষাট বছর। মরহুম শহীদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার প্রপিতামহ মোকাররম বাবু এজাজ হোসাইন সাহেবের ভাই হযরত সারফরাজ হোসাইন সাহেব দেহলভী (রা.)-এর মাধ্যমে হয়েছিল যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে শহীদ মরহুমের প্রপিতামহ বাবু এজাজ হোসাইন সাহেব দেহলভী তার ভাইয়ের মাধ্যমে বয়আত করেন। শহীদ মরহুমের প্রপিতামহ বাবু এজাজ হোসাইন সাহেব এবং দাদা বাবু নজীর আহমদ সাহেব- দুজনই একজনের পরে আরেকজন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত দিল্লীর আমীর হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। শহীদ মরহুম এফ.সি. কলেজ লাহোর থেকে এফ.সি.এস সম্পন্ন করেন এরপর রাওয়ালপিন্ডি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। আর সেখান থেকে ১৯৯০ এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি লাভ করেন এবং এম.বি.বি.এস. করার পর পাঞ্জাব পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা পাস করেন। এরপর চার বছর সার্ভিস হাসপাতাল এবং জিন্নাহ হাসপাতাল, লাহোরে চাকুরি করেন। ১৯৯৮ সালে রয়েল কলেজ অফ ফিজিশিয়ান, ইউকে থেকে সদস্যপদ এবং ২০২১ সালে ফেলোশিপ লাভ করেন।

মরহুম শহীদ ২০০১ সালে সারগোদা শিফট হয়ে আসেন। সারগোদা আসার পেছনে তার মানবতার সেবা করার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি সারগোদা জেলার প্রথম বিশেষজ্ঞ হেপাটোলোজিস্ট (লিভার) ছিলেন। সারগোদায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে যোগদান করেন। যেটির মালিকের সাথে ডাক্তার সাহেবের অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল। কিন্তু তার রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা ছিল। ২০১৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি অংশ নিতে চেয়েছিলেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাকে মৌলভীরা এই বলে হুমকি দেয় যে, আমরা এই করবো, সেই করবো। তখন তিনি ডাক্তার সাহেবকে বলেন, আপনি হাসপাতাল ছেড়ে দিন। আমার উপায় নাই, এখন আপনি আর আমার সাথে কাজ করতে পারবেন না। যাহোক, ডাক্তার সাহেব (উক্ত হাসপাতাল) ছেড়ে অন্য হাসপাতালে যোগদান করেন।

২০০১ সালে যখন তিনি সারগোদায় আসেন তখন থেকেই নিয়মিত ফযলে ওমর হাসপাতাল, রাবওয়াতে ভিজিটিং ডাক্তার হিসেবে সময় দিচ্ছিলেন। আল্লাহ তাঁর হাতে রোগমুক্তির শক্তি দিয়েছিলেন এবং অসংখ্য মানুষ তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। তিনি জাগতিক জ্ঞানের পাশাপাশি গভীর ধর্মীয় জ্ঞানও রাখতেন। পবিত্র কুরআনের তফসীর, তাযকেরা, রূহানী খাজায়েনসহ অন্যান্য জামা'তী পুস্তক এবং বিতর্কিত বিষয়াদির পুস্তকের গভীর পড়াশুনা ছিল। শহীদ মরহুম সারগোদা জেলার নায়েব আমীর হিসেবে সেবা করার তৌফিক পেয়েছেন। মেডিকেল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠার পর এর সদস্য ছিলেন। ২০২৪ তিনি নায়েব সদর এসিসট্যান্ট নিযুক্ত হন এবং সারগোদা চ্যাপ্টারের প্রধান ছিলেন। গত তিন বছর থেকে তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা নিজ অসুস্থতার ওপর অন্যের অসুস্থতাকে প্রাধান্য দিতেন এবং সবসময় সেবা করার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। রোগীদের প্রতি সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং অভাবীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা ছিল তার উল্লেখযোগ্য গুণ। অভাবীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া ছাড়াও ফেরার জন্য পথখরচ দিয়ে দিতেন। বরং কিছু পরীক্ষা বিনামূল্যে করিয়ে দিতেন এবং এর মূল্য দিয়ে দিতেন। যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে , সারগোধা জেলার প্রথম লিভার তথা যকৃত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল মেয়েদের বিবাহে গোপনীয়তা রক্ষা করে তাদের বড়ো ধরণের সাহায্য করতেন। একজন অভাবীকে দীর্ঘদিন যাবত নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতেন। প্রথমে তো সেই ব্যক্তি মাসে এক দুইবার আসতো। এরপর সে দুই তিনদিন পর পর আসা শুরু করে। কিন্তু তবুও তার সাহায্য করা অব্যাহত রাখেন। একদিন সে কোন জেদ বা চাপাচাপি বেশি করে থাকবে যার কারণে কোন কঠোর বাক্য ডাক্তার সাহেবের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়। সাধারণত ডাক্তার সাহেব রেগে যেতেন না, অত্যন্ত নরম হৃদয়ের ছিলেন। যেহেতু প্রকৃতিতে নম্রতা ছিলো, পূণ্য ছিলো; সারা রাত অস্থির ও দুঃশ্চিন্তগ্রস্থ ছিলেন যে, আমি কেন তাকে কঠোর কথা বললাম। পরবর্তী দিন তাকে ডাকেন ও তার কাছে ক্ষমা চান এবং পুনরায় তাকে অনেক টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন। জামা'তের বুযুর্গদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো। প্রয়োজন পড়লে রাবওয়া গিয়ে বিশেষভাবে রোগীদের পরিদর্শন করতেন ও ব্যবস্থাপত্র প্রস্তাব করতেন।

শহীদ মরহুমের মা মোহতরমা আমাতুল হাই সাহেবা বলেন, মরহুম পিতা-মাতাকে অনেক সম্মান করতেন। সকল প্রয়োজনীয়তা না চাইতেই পূরণ করতেন। কখনো আমরা দাবি করি নি কিন্তু তিনি পূরণ করতেন। শৈশব থেকেই অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। নিজের কাজের প্রতি মনোযোগী, খেলাফতের সাথে সীমাহীন ভালোবাসা ছিলো, দরিদ্র ও রোগীদের অনেক খেয়াল রাখতেন। আর্থিক লেনদেনের পূর্ণ হিসাব রাখতেন। বংশের সবাইকে পরস্পর বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

তাঁর সহধর্মীনী নূর সাহেবা বলেন, সন্তানদের সর্বদা জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করার উপদেশ দিতেন। খেলাফতের সাথে অসাধারণ ভালোবাসা ছিলো, খুতবাসমূহ নিয়মিত শুনতেন ও বিভিন্ন পয়েন্ট নিজ ডায়েরীতে নোট করতেন। খুব কম লোক রয়েছেন যারা এমন করেন, বরং ওয়াকফে জিন্দেগীরাও এমন করেন না। খুতবার পয়েন্ট নোট করতেন যেন কাজে আসে। চাঁদা আদায়েও দৃষ্টান্তমূলক ছিলো। শাহাদাতের সময় তাঁর ২০২৫ পর্যন্ত ওসীয়্যতের চাঁদা আদায় করা ছিলো।

তাঁর চারজন সন্তান, দুই পুত্র ও দুই কন্যা। তাঁর এক পুত্র ডাক্তার বাসীর, তিনি বলেন, আমাদেরকে সর্বদা খেলাফতের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তাগাদা দিতেন। তাঁর কন্যা সায়েমা বলেন, অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা ছিলেন। আমার বিবাহের সময় আমাকে একটি উপদেশ দিয়েছিলেন যে, আমার কন্যা! নিজ শশুরালয়ে গিয়ে সর্বদা জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। যদি কখনো কোন উপায়ে জামা'তের সেবার সম্মান লাভ হয় তাহলে অস্বীকার করবে না। তিনি আরো বলেন, নিয়মিত ব্যস্ততাতেও জামা'তের সেবার সুযোগ বের করে নিতেন।

তাঁর একজন পুত্রবধু লিখেন, আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসার ওপর গুরুত্বারোপ করতেন। যখনই কোন বিষয়ে দিক নির্দেশনার আবেদন করেছি, তখন তিনি নিজ কথা দোয়ার মাধ্যমে শুরু করে দোয়ার মাধ্যমেই শেষ করেছেন। তাঁর বোন লিখেন, জামা'তের বিরোধীতার তীব্রতার কারণে সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। রাতে উঠে নফল আদায় করা এবং তাহাজ্জুদ দৈনন্দিন অভ্যাস ছিলো। সারগোধা জেলার আমীর খালেদ মাহমুদ সাহেব লিখেন, দরিদ্রদের জন্য ত্রাণকর্তা এবং মহান ব্যক্তি ছিলেন। মানুষের উপকার সাধন ছাড়াও বিনয় ও নম্রতার গুণ স্পষ্ট ছিলো। প্রায়শই দরিদ্র রোগীদের ফিস ফেরত দিয়ে দিতেন। জামা'তের জন্য কুরবানী করার বৈশিষ্ট্যও অনন্য ছিল। ওয়াদা অনুযায়ী চাঁদা আদায়ের পাশাপাশি অন্যান্য বর্ধিত খাতেও বিশেষ সহযোগিতা করতেন। জামা'তের কর্মকর্তাদের অনেক সম্মান করতেন।

সারগোধার মুরুব্বী সিলসিলা যুবায়ের সাহেব বলেন, "আমাদের অত্যন্ত ভালোবাসার পাত্র, মানবতার সেবক, দয়া ও মমতার মূর্তপ্রতীক, লক্ষ মানুষের ত্রাণকর্তা, খেলাফতের জন্য নিবেদিত প্রাণ, ফেরেশতা তুল্য এক ব্যক্তি আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন। শহীদ মরহুম একজন দরবেশ মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি দিক আদর্শ স্থানীয় ছিল। যখনই কোন কর্মকর্তা বা ওয়াকফে জিন্দেগী তাঁর কাছে আসতেন তিনি চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে যেতেন,আর বিদায় দেওয়ার সময়েও দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন।" তিনি বলেন, "তাঁকে যখন এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় যে, পরিস্থিতি ভালো না, নিজের সাথে কোন নিরাপত্তা কর্মী বা সেবক রাখুন যাতে সতর্কতা অবলম্বনের দিকটি পূর্ণ হয়। এতে ডাক্তার সাহেব সর্বদা এ উত্তরই দিতেন যে, আমি নিরাপত্তার জন্য কোন গার্ড বা সেবক নিজের সাথে রাখতে তো পারি কিন্তু এটি সহ্য করতে পারবো না যে, আল্লাহ্ না করুন কেউ আমাকে মারতে আসলো আর আমার কারণে অন্য কারো প্রাণ নাশ হলো।" বিরুদ্ধবাদীরা যদিও তাঁর বিরুদ্ধে পুরো জেলাতে বিজ্ঞাপন বিতরণ করেছিলো যে তাঁকে যেন হত্যা করা হয়, তিনি শাস্তিযোগ্য, কিন্তু তবুও তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করেননি। বিরুদ্ধবাদীরা আহমদীদের মাঝে যাদেরকে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল তাদের যে তালিকা প্রস্তুত করেছিল সেখানে ডাক্তার সাহেবের নাম তালিকার শীর্ষে ছিল। এমনকি আকরাম তুফানী নামে সেখানের এক মৌলভি তাঁর বিরুদ্ধে 'ওয়াজেবুল কাতাল' হওয়ার বিষয়ে ফতোয়া দেয় এবং এই ফতোয়া বন্টনও করে, এতদসত্ত্বেও সরকার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি।

'ফাতেমা হাসপাতাল' নামের একটি খ্রিস্টান হাসপাতালের ব্যবস্থাপক যিনি একজন পাদ্রিও, তিনি বলেন, "মানবতার সেবক এক ব্যক্তিত্ব আমাদের

এরপর শেষের পাতায়....

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

‘আগামী শতাব্দীতে ওয়াকফে জিন্দগীর ভীষণ প্রয়োজন দেখা দিবে। খোদার দরবারে এই শতাব্দীতে জামাতের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ওয়াকফীনে জিন্দগী উপস্থাপিত হবে। কিন্তু তারা কাজে আসবে আগামী শতাব্দীতে। অতএব, এই উপহার আমরা আগামী শতাব্দীকে দিতে চলেছি। তাই যারা তৌফিক লাভ করছেন, তারা এই উপহারের জন্য প্রস্তুত হোন।”

আঁ হযরত (সা.) বললেন, *‘মা আনা ওয়াদ দুনিয়া’* জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? আমি তো সেই পথিকের ন্যায় যে বৃক্ষতলে তিষ্ঠ ক্ষণকালের পর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করে। মানবজাতিকে দেওয়া সততা ও সেবার এটাই শেষ সুযোগ। এরপর আর কোন সুযোগ থাকবে না। বড়ই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে এমন সুযোগ হাতছাড়া করে। ” [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর (২০১৪)

ওয়াকফীনে নও ক্লাস

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে ক্লাসের সূচনা হয়। হান্নান বাজওয়া তিলাওয়াত করেন এবং হারুন আতা তিলাওয়াকৃত আয়াতের উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

এরপর আঁ হযরত (সা.) নিম্নোক্ত হাদীস এবং এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

‘হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন , মাদুরের উপর শোয়ার কারণে আঁ হযরত (সা.)-এর শরীরে দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমি এটা দেখে নিবেদন করলাম- আমাদের প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গিত, আপনি যদি অনুমতি দেন, আমরা এই মাদুরের স্থানে কোন তোশক বিছিয়ে দিচ্ছি যা আপনাকে এর কাটব্য থেকে রক্ষা করবে। একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) বললেন, ***‘মা আনা ওয়াদ দুনিয়া’*** জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? আমি তো সেই পথিকের ন্যায় যে বৃক্ষতলে তিষ্ঠ ক্ষণকালের পর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করে। (ইবনে মাজা)

এরপর ফারায আলি মালফুযাত থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, ‘স্মরণ রেখো, যে বস্তু আল্লাহ্ তা’লার নিকট মানুষের মূল্যকে বর্ধিত করে তা সেটা হল খোদা তা’লার প্রতি তার নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা। ... যে ব্যক্তি খোদা তা’লার নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখে না, বরং বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে কোন উপকারে আসতে পারে? তার কোন মূল্য নেই। সকল মূল্য ও সম্মান বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইব্রাহিম (আ.) যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন, তার কারণ কি ছিল? কুরআন শরীফ সিদ্ধান্ত করেছে- وَاِبۡرٰهِيۡمَ الَّذِىۡ وَفّٰٓى (আননাজাম: ৩৮)। অর্থাৎ তিনি ইব্রাহিম যে আমাদের সঙ্গে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছে। তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে, কিন্তু তিনি কাফেরদের প্রতিমাদের উপাসনা করাকে মেনে নেন নি। খোদা তা’লার জন্য সকল দুঃখ-কষ্ট সহন করতে উদ্যত হয়েছেন। খোদা তা’লা নির্দেশ দিলেন, নিজের স্ত্রীকে শুষ্ক মরুভূমিতে নির্বাসন দিয়ে এস। তিনি অবিলম্বে সেই নির্দেশ শিরোধার্য করেন। প্রত্যেকটি বিপদকে তিনি শিরোধার্য করে আল্লাহ্ তা’লার ভালবাসায় আত্মবিলীনতার পর্যায়ে পৌঁছেছেন, মাঝে কোন নিজের স্বার্থ ছিল না। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সা.) বহু বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন। স্বজন-বিজন সকলে তাঁকে প্রলোভন দিয়েছে যে, আপনি ধন-সম্পদ নিলে নিন, আমরা দিতে প্রস্তুত আছি। আপনি রাজত্ব নিলে নিন, আমরা দিতে প্রস্তুত আছি। আপনার যদি নারীর প্রয়োজন হয়, তবে তাও দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আঁ হযরত (সা.)-এর উত্তর এটাই ছিল যে, আল্লাহ্ তা”লা আমাকে তোমাদের শিরক দূর করার জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। তোমরা আমাকে যেমন খুশি কষ্ট দিতে পার। আমি এই কাজ থেকে বিরত থাকতে পারি না। কেননা আল্লাহ্ তা’লা এই কাজ যখন আমার সোপর্দ করেছেন, পৃথিবীর কোন প্রলোভন ও ভীতি আমাকে এর থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। তিনি যখন তায়েফে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে যান, তখন দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা তাঁকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। তিনি দৌড়তে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু এমন বিপদও তাঁকে নিজের দায়িত্ব থেকে বিমুখ করতে পারে নি। এর থেকে জানা যায় যে, সত্যবাদীদেরকে কিরূপ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সকল বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও একদিন তাদেরও মূল্যায়ন হয়ে থাকে। সেই দিন তাদের সত্যতা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় এবং সমগ্র জগত তাঁর দিকে ধাবিত হয়। ”

তিনি আরও বলেন, “ এখন সততা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনের সময় আর এটাই শেষ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই সময় আর ফিরে আসবে না। এটা সেই সময় যখন, সকল নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীর এখানে পরিসমাপ্তি ঘটছে। অতএব, মানবজাতিকে দেওয়া সততা ও সেবার এটাই শেষ সুযোগ। এরপর আর কোন সুযোগ থাকবে না। বড়ই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে এমন সুযোগ হাতছাড়া করে। ”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫১৬-৫১৭)

তাহরীকে ওয়াকফে নও-এর ২৫ বছর পূর্তি

খোদার পথে জীবন উৎসর্গীকরণ ধর্মীয় ইতিহাসে অনেক প্রাচীন রীতি। এক্ষেত্রে সব থেকে বড় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন স্বয়ং আম্বিয়া (আ.), তাঁর অনুসারীদের মধ্যে তাঁর খলীফা ও সাহাবাগণ। জামাত আহমদীয়ার সূচনালগ্ন থেকেই অনেক সাহাবা ইসলাম আহমদীয়াতের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করার তৌফিক লাভ করেছেন। পরবর্তীতে কালে বিভিন্ন সময়ে সকল আহমদীদের এই পুণ্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য খোদা তা’লার আদেশে খলীফাগণ বিভিন্ন উপায়ে আহ্বান জানিয়ে এসেছেন। যেমন- ওয়াকফে জিন্দগী, ওয়াকফে আরজি, ওয়াকফে আওলাদ এবং অবসর জীবন পরবর্তী জীবনে উৎসর্গীকরণের বিভিন্ন তাহরীকের সূত্রপাত হয়েছে। এই সকল তাহরীকে হাজার হাজার আহমদীরা অংশগ্রহণ করে খোদা তা’লার পুরস্কাররাজির ভাগী হয়েছেন।

জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনার পূর্বে ভবিষ্যতে জামাতের উন্নতির প্রস্তুতির জন্য খোদা তা’লা এক গুরুত্বপূর্ণ তাহরীকের প্রতি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি (রাহে.) ১৯৮৭ সালের ৩রা এপ্রিল ‘ওয়াকফে নও’ তাহরীকের সূচনা করে বলেন, “আমাকে খোদা তা’লা এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, আমি যেন আপনাদের জানিয়ে দিই যে, আগামী দুই বছরের মধ্যে এই অঙ্গীকার করুন, যার যে সন্তান জন্ম লাভ করবে সে খোদা তা’লার নিকট উপস্থাপন করবে। ” তিনি আরও বলেন, ‘আগামী শতাব্দীতে ওয়াকফে জিন্দগীর ভীষণ প্রয়োজন দেখা দিবে। খোদার দরবারে এই শতাব্দীতে জামাতের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় ওয়াকফীনে জিন্দগী উপস্থাপিত হবে। কিন্তু তারা কাজে আসবে আগামী শতাব্দীতে। অতএব, এই উপহার আমরা আগামী শতাব্দীকে দিতে চলেছি। তাই যারা তৌফিক লাভ করছেন, তারা এই উপহারের জন্য প্রস্তুত হোন।”

(জুমার খুতব, ৩ এপ্রিল, ১৯৮৭)

এই তাহরীকের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হুযুর (রাহে.) বলেন: “আগামী শতাব্দীতে সারা বিশ্ব থেকে ওয়াকফীন শিশুদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী এমন ভাবে প্রবেশ করবে যেন তারা পৃথিবী থেকে স্বাধীনতা লাভ করছে আর মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর খোদার দাস হয়ে এই শতাব্দীতে প্রবেশ করবে। ছোট ছোট শিশুরা খোদার দরবারে উপহার হিসেবে উপস্থাপিত হবে। আর এটা এই মুহূর্তের সব থেকে বেশি প্রয়োজনের জিনিস। আগামী বছরগুলিতে সর্বত্র যে ব্যপকহারে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটতে চলেছে, সেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাসের প্রয়োজন, যারা মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর খোদার দাস হবে। প্রত্যেক দেশ থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের থেকে বিপুল সংখ্যক ওয়াকফীনে জিন্দগীর প্রয়োজন।”

(খুতবা জুমআ, ৩ এপ্রিল, ১৯৮৭)

মহান আল্লাহর বাণী

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না, সে নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল-বাকারা: ২০৯))

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী
(সাম্যবাদের প্রবর্তক)

يَآ يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً

অনুবাদ: হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন কর। যিনি তোমাদিগককে একই আত্ম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে উহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উভয় হইতে বহু নর নারী বিস্তার করিয়াছেন। (সূরা নিসা:২)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

অনুবাদ: হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও পুরোপুরি অবহিত।

(আল হুজরাত-১৪)

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (كهف:111)

অনুবাদ: হে মহম্মদ (সা.)! তুমি বল, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, (কিন্তু) আমার প্রতি এই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বুদ একই মা'বুদ। (সুরা কাহাফ, আয়াত: ১১১)

ইসলামিক সাম্যের দর্শনের সারাংশ কুরআনের এই কয়েকটি আয়াতে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে যেগুলি এখনই আমি তেলাওয়াত করলাম এবং এর অনুবাদ শোনালাম।

সূরা নিসার আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির চিরন্তরন ও চিরস্থায়ী সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পৃথিবীতে প্রকৃত সাম্যের ভিত্তি স্থাপন করেছেন যে তারা সবাই একই পিতার সন্তান এবং একই গাছের শাখা প্রশাখা এবং এই নীতির প্রতি ইঞ্জিত করেছেন যে, পরবর্তী পরিস্থিতির ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষ এবং বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যতই মতভেদ সৃষ্টি হোক না কেন, তাদের পারস্পরিক বিষয়ে এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তবে তারা তাদের উৎপত্তির দিক থেকে একই দম্পতির বংশধর।

আর সূরা হুজরাতের আয়াতে তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানব সমাজে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রের বিভাজন দেখা যায় এটি কেবলমাত্র পরিচয় এবং পরিচয়ের একটি মাধ্যম। এই বিভক্তিকে একে অপরের বিরুদ্ধে গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি করার কারণ বানাবেন না। এবং স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ্ তা'লার নিকট বরং নেক (ধার্মিক) সমাজেও সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী এবং অধিক নেক ও অধিক পুণ্যবান।

মুহসিনে ইনসানিয়্যত (মানবতাবাদী) হযরত আকদস মোহাম্মদ (সা.) ঘোষণা দিয়ে বলেন যে, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ স্মরণ রাখবে! আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ এবং মানবতার সম্মানকে পরম মার্গে পৌছে দিয়েছে।

শ্রোতাবৃন্দ! বিশ্ব আজ নিরাপত্তাহীনতা ও উদ্বেগে ভুগছে। এর প্রধান কারণ ধর্মীয় বিদ্বেষ, দ্বিতীয়ত জাতিভেদ এবং বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্য। কখনও শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব কখনও পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কখনও জাতিগত আধিপত্যের দাবি, আবার কখনও উচ্চতর বর্ণের মায়া যা অন্য মানুষকে নিকৃষ্ট ও অবজ্ঞার চোখ দেখায় এবং এইভাবে মানুষ মানুষের মধ্যে বিদ্বেষের একটি লৌহ প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পটভূমিতে আজ সর্বত্র সাম্য ও সমতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কার্যত সবুজ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা কতটুকু সম্ভব হয় এবং কতটুকু সম্ভব হয়েছে এবং বাস্তবতা কি চিত্র তুলে ধরছে তা এই স্বল্প সময়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে ঘোষণা ও অপপ্রচার অস্বীকার করা যাবে না। উন্নত দেশগুলির পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার স্বাগত ঘোষণা রয়েছে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হোক বা সমাজতন্ত্র বা সমবায় ব্যবস্থা, সকলেই সাম্য ও সমতার দাবি করে। যেমন ধনী গরিবের পার্থক্য মুছে দিতে হবে। নারী পুরুষের মধ্যে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শাসক ও প্রজা, মালিক (কর্তা) ও শ্রমিককে এক সারিতে দাঁড় করাতে হবে ইত্যাদি।

যেখানে বাস্তবে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কোন বিষয়ে মানবজাতির মধ্যে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। যদি করা যায় তাহলে কতটুকু করা যায়।

এর জন্য আমাদেরকে আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত স্রষ্টা তাঁর মৌলিক গুণাবলী রবুবিয়্যত বা প্রভুত্ব, রহমানিয়্যত বা করুণা বা অনুগ্রহ, রহিমিয়্যত বা দয়ালু এবং মালকিয়্যত বা মালিক, ইয়াও মিদ্দীন বা বিচার দিবসের মালিক সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কেবল প্রথম গুণাবলীকে নিয়ে নিন যে কোরআন করীম আল্লাহ তা'লাকে রাব্বুল আলামীন বা জগতসমূহের প্রতিপালক আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ সমস্ত জগতের সকল সৃষ্টির পালনকর্তা ও প্রভু। তিনি কেবল মুসলমানদের বা খৃষ্টানদের বা ইহদী ও নাসারাদের রব বা প্রভু নন। তাঁর স্বর্গীয় ব্যবস্থা এবং পার্থিব ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষকে তাঁর প্রভুত্ব ও করুণার গুণাবলীর অধীনে সমান অনুগ্রহ করেছে। তা নির্বিশেষে একজন ব্যক্তি এই খোদাকে বিশ্বাস করুক বা না করুক, তাঁর সূর্য, তাঁর চন্দ্র সবাইকে আলো দিচ্ছে। তাঁর ভূমি, তাঁর নদী, তাঁর বাতাস সব কিছু নির্বিশেষে সকলকে অনুগ্রহ করছে।

এগুলো শারিরীক বৃদ্ধি ও বিকাশের উপায় ও উপকরণ। একইভাবে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি ও উন্নতির ক্ষেত্রে খোদাতা'লা কোন জাতির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন নি। প্রত্যেক জাতিতে তিনি তাদের রসুল ও পথপ্রদর্শক প্রেরণ করেছেন। যেমনটি কুরআনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ (সূরা ইউনুস: ৪৮) এবং وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (সূরা রাআদ:৮) ইত্যাদি এর সাক্ষী আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যিনি রব্বুল আলামীন জগতসমূহের প্রতিপালক প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক উম্মতে পথপ্রদর্শক ও রসুল প্রেরণ করেছেন। এবং ঐ সমস্ত নবীদের মধ্যেও সমতা বজায় রেখেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা দিলেন لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ অ থ´ া ৎ আমরা মুসলমানেরা খোদার নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না অর্থাৎ নবুয়্যতের দিক থেকে সবাই সমান। হ্যাঁ, তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য এবং পরিধির দিক থেকে তাদের পদমর্যাদার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ! এখন আমি মানুষের সৃষ্টি অর্থাৎ জন্ম ও তদের মানসিক ও শারিরিক সক্ষমতা সম্পর্কে তাদের অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সমতার দিকে খুব বেশি না গিয়ে সাইয়্যেদানা হযরত আকদদস মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর বিজয়ী হজ্জের খোতবার আলোকে কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

স্মরণ রাখবেন যে, সৈয়্যদানা হযরত আকদস মুহাম্মদ (সা.) ৯ম হিজরীতে বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করেন। বর্ণনা অনুযায়ী এক লক্ষ চব্বিশ হাজারেরও বেশি সাহাবা এতে অংশ নিয়েছিলেন। এটি ছিল মহানবী (সা.) এর প্রথম ও শেষ হজ্জ। যা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত। এতে রসুলুল্লাহ্ (সা.) আরাফাত ও মিনার ময়দানে দীর্ঘ খোতবা প্রদান করেন যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মাধ্যমে বুখারী শরীফ ও মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল ইত্যাদি হাদিস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই খোতবা মৌলিক মানব কল্যাণ সম্পর্কে এবং এতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্মের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমি আমার বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র মানবিক সাম্যের দিকটি বিবেচনা করে আমি এই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ খোতবার কয়েকটি অনুচ্ছেদের অনুবাদ উপস্থাপন করছি।

১১ই যিল হজ্জ মিনার ময়দানে আঁ হযরত (সা.) খোতবা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, 'হে লোক সকল! আমার কথাগুলো ভালভাবে শোনো কারণ আমি জানি না যে এই বছরের পর আমি তোমাদেরমাঝে এইখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করব কি না।"

" হে লোকসকল! তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতাও এক ছিলেন। সুতরাং সাবধান এবং শোন! অ-আরবদের উপর আরবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং আরবদের উপর অ-আরবদের কোন কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনুরূপভাবে কৃষ্ণাঙ্গের উপর লাল ও সাদা মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং সাদা মানুষের উপর কালো মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যে তার ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য এগিয়ে যায় সে সর্বোত্তম।"

পুনরায় বলেন, "হে মুসলমানগণ! ঈমানের মাধ্যমে খোদা তা'লা তোমাদের থেকে অজ্ঞতার যুগের অযথা অহংকার ও অভিমান এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের কারণে অনর্থক রোগ ব্যধি দূরকরে দিয়েছেন।....... স্মরণ রাখবেন সকল মানুষ আদমের বংশধর এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি।"

তিনি আরও বলেন, "পৃথিবীর

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও।

(আলে ইমরান:২৭)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

মানুষ খনিজ পদার্থের মত, যেগুলি একই উপাদান এবং একই মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে তারা বিভিন্ন রং এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে কিন্তু শুনুন প্রগতি ও মহত্বের সুপরিচিত প্রতীকগুলি যা ইসলামের পূর্বে অজ্ঞতার যুগে প্রচলিত ছিল। (অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞা, প্রতিরোধ ও সাহসিকতা শক্তি এবং প্রভাব ইত্যাদি) এখনও প্রতিষ্ঠিত। আর এসব গুণের কারণে জাহেলিয়াতের যুগে যাদেরকে মহান বলে গণ্য করা হতো তারা এখন ইসলামে মহান বলে বিবেচিত হবে। তবে শর্ত হলো তারা যেন দ্বীনি জ্ঞান ও ব্যক্তিগত পুণ্য অর্জন করে।"

তিনি আরও বলেন:'হে লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের কিছু অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের স্ত্রীদেরও কিছু অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল তারা যেন সতীত্ব ও পবিত্রতার সহিত জীবনযাপন করে এবং এটা তোমাদের দায়িত্ব যে তুমি তোমার অবস্থা অনুযায়ী তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। এবং স্মরণ রাখবে আপন স্ত্রীদের সহিত সর্বদা ভালো ব্যবহার করবে কারণ সর্বশক্তিমান খোদা তোমাকে তাদের যত্নের দায়িত্ব দিয়েছেন। তুমি যখন তাদের সহিত বিয়ে করেছিলে তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহকে তাদের অধিকারের নিশ্চয়তাদানকারী বানিয়েছিলে। এবং সর্বশক্তিমান খোদা তা'লার আইনের অধীনে তুমি তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলে। সুতরাং মহান খোদা তা'লার আইনকে অবজ্ঞা করবে না এবং নারীর অধিকার আদায় করার প্রতি সর্বদা যত্নবান থাকবে। "

পুনরায় তিনি বলেন: " হে লোক সকল! তোমাদের হাতে এখনও কিছু যুদ্ধবন্দী আছে। আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা নিজেরা যা খাবে তাই তাদের খাওয়াবে এবং তাদের তাই পরাবে যা তোমরা পরবে। যদি তারা এমন কোন দোষ করে যা তোমরা ক্ষমা করতে পারবে না তাহলে তাদেরকে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দাও, কেননা তারা খোদা খোদা তা'লার বান্দা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়।"

তিনি (সা.) আরও বলেন:

"হে লোকসকল! প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, তোমরা সবাই একই পদমর্যাদার। তোমরা সবাই মানুষ যেই জাতির হও যেই মর্যাদার হও, মানুষ হওয়ার জন্য মর্যাদার দিক দিয়ে সবাই সমান। এই কথা বলতে বলতে তিনি (সা.) নিজের দুটি হাতওঠালেন এবং দুই হাতের আঙ্গুলগুলোকেক এক সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন এবং বললেন, যেমন, দুই হাতের আঙ্গুলগুলি সমান সমান ঠিক তেমনই মানব জাতি পরস্পর সমান। তোমাদেরকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা প্রদর্শন করার কোন অধিকার নেই। তোমরা ভাইয়ের মত।"

তিনি আরও বলেন:

"তোমরা কি জান এটি কোন মাস? তোমরা কি জান এটি কোন এলাকা? তোমরা কি জান এটি কোন দিন? লোকেরা বলল, হ্যাঁ! এটি হল পবিত্র মাস, এটি পবিত্র এলাকা এবং এটি হজ্জের দিন। প্রত্যেকটি উত্তরে রসুল করীম (সা.) বললেন, যেমন এই মাসটি পবিত্র,যেমন এই এলকাটি পবিত্র,যেমন এই দিনটি পবিত্র, একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মানুষের জীবন ও সম্পদকে পবিত্র ও হারাম ঘোষণা করেছেন। এই আদেশ আজকের জন্য নয়। আগামীকালের জন্য নয় বরং সেই দিনের জন্য যেদিন তোমরা খোদার সঙ্গে দেখা করবে। (সেই দিন পর্যন্ত)

পুনরায় তিনি বলেন,

"আজ আমি তোমাদের যে কথাগুলি বলছি এই সব (কথাগুলি) পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দাও কারণ এটা সম্ভব যে আজ যারা আমার কথা শুনছে তাদের চেয়ে যারা আমার কথা শুনছে তারা এদের থেকে বেশি অনুসরণ করবে।"

(বুখারী,কিতাবুল মাগাযি, বাব হাজ্জাতুল বিদা)

এই খুতবা বিভিন্ন বর্ণনাসমূহ বিভিন্ন গ্রন্থে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এইটি বর্ণনাতে এইভাবে এসেছে যে, আঁ হযরত (সা.) যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, এটি কোন মাস তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল ভাল জানেন এবং আমরা ভাবলাম যে আপনি হয়তো এই মাসটির অন্য নাম রাখবেন। তখন তিনি (সা.) নিজেই উত্তর দিলেন যে, এটি কি পবিত্র মাস নয়?

তবে বর্ণনার ভিন্নতা যাই হোক না কেন, ঐতিহাহিস ও ইতিহাস রচনাকারী এই খুতবায় মানবতাবাদী হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত নির্দেশাবলীকে আগে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশাবলী কেবলমাত্র অস্থায়ী এবং একটি এলাকার জন্য সীমাবদ্ধ থাকার জন্য নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্মের জন্য নির্দেশিকা রয়েছে। এর সারমর্ম হল এই যে,

১) প্রথমত, সমস্ত মানবজাতির এই নীতিটি বিবেচনা করা উচিত যে, সমস্ত মানবসমাজ একই সত্তা থেকে সৃষ্ট এবং একই পিতার বংশধর এবং একই গাছের শাখা প্রশাখা তাই মানবতার দিক থেকে সকল মানুষ সমান।

২) এই জাতিগত ঐক্যের পরও এটা সম্ভব। যেমন ভূগর্ভ থেকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বের হয়, কয়লা, লোহা, তামা, সোনা ইত্যাদি বের হয়। একইভাবে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা ও প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট ও স্বতন্ত্রের উদ্ভব হতে পারে কিন্তু এই স্বতন্ত্র ও পার্থক্যের কারণে একটি জাতি বা একটি গোত্র বা ব্যক্তি অন্য জাতি বা গোত্র বা ব্যক্তিদের উপর অযথা গর্ব ও অহংকার করা উচিত নয়।

৩) মুসলমানরা এই অর্থে যে তারা এক নবীর উম্মত এবং একই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তারা একই আধ্যাত্মিক পিতার সন্তান, তাই তাদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। যেমন মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ অর্থাৎ নিশ্চয় মোমেনগণ পরস্পর ভাই ভাই।

(আল হুজরাত: ১১)

৪) সমাজে কিছু দুর্বল ও দরিদ্র লোকও আছে যারা মর্যাদাবান ও সম্ভ্রান্তদের সেবক হিসেবে কাজ করে। অথবা যুদ্ধে পরাজিত জাতি থেকে অনেক লোক বিজয়ী জাতির নিয়ন্ত্রণে আসে,তাদের সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) এমন নির্দেশ জারি করেছেন যা আজকের সভ্য বিশ্বে বিস্ময়ের সাথে দেখা ও শোনা যায় যে, দাস ও বন্দীদেরকেও মালিকের সমান ঘোষনা করা হয়েছে, যদিও দাস ও বন্দীরাও মানুষ, তাই তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের যত্ন নেওয়া এবং তাদের সামর্থের বাইরের কাজ না নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৫) আজকাল নারী-পুরুষের সমতা একটি বড় সমালোচনার কারণ হয়েছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে দিন দিন আপত্তি উঠছে যে, ইসলাম নারীদেরকে পুরুষদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে নারীদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে এবং পর্দার মধ্যে বাড়িতে বন্দী করে রেখেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহানবী (সা.) তাঁর খুতবায় নারীদের প্রতি যত্নবান থাকা এবং তাদের অধিকার প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আর পবিত্র কুরআন নারী ও পুরুষের সৃষ্টির পার্থক্যকে সামনে রেখে নারীদেরকে যে পরিমাণ সম্মান প্রদান করেছে এবং তাদের অধিকার, আবেগ অনুভূতিকে যে পরিমাণে সুরক্ষিত করেছে, পৃথিবীর কোন সমজ বা কোন ধর্মই তার উদাহারণ পেশ করতে পারে না। এটি একটি পৃথক কোন স্থায়ী বিষয় বা এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করার সময় ও সুযোগ নেই।

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ! আসল সমস্যা হল মানবতার সমতা প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়, কিন্তু কোন বিষয়ে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা দেখা হয় না যতদূর মানুষত্বে ও মানবতার সম্পর্ক সব মানুষই সমান। প্রতিটি মানুষের দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি পা, জিহ্বা, নাক, হৃৎপিন্ড, মস্তিষ্ক ইত্যাদি সৃষ্টিকর্তা সব মানুষকে দান করেছেন। ইল্লা মাশাআল্লাহ্ তা ছাড়া কিছু প্রতিবন্ধীও আছে।

কিন্তু এই সব কিছু মানুষের অধিকার প্রদানে সমতা প্রতিষ্ঠা করা মৌলিক দায়িত্ব। এই বিষয়ে স্মরণ রাখতে হবে যে, মানবাধিকার দুই প্রকার।

১)একটি হল সরকার যে অধিকারগুলির জন্য দায়ী সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى. وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى. (سورۃ طٰہٰ:119-120)

অর্থাৎ একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের লক্ষণ হল যে, (হে লোকসকল) নিশ্চয় ইহাতে তোমাদের জন্য (বিধি ব্যবস্থা) রহিয়াছে যে, তুমি ইহাতে ক্ষুধার্ত থাকিবে না এবং উলঙ্গও থাকিবে না এবং ইহাতে তৃষ্ণার্ত থাকিবে না এবং রৌদ্রেও পুড়িবে না। (সূরা তাহা-১১৯-১২০)

তাই এটি পরিচালনা করা প্রতিটি সরকারের মৌলিক দায়িত্ব যে দেশের ও জাতির কোন মানুষ ন্যুনতম প্রয়োজনে কেউ যেন কষ্ট না পায়।

একইভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং জাতীয় পদে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের নিয়োগ করা এবং

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে। (ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: Sayen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

বাধ্যতামূলক কর ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ বন্টন পরিচালনা করা, এইগুলি সরকারের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য অধিকারগুলি হল যা প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিকভাবে অর্জিত হয়। যেমন শারীরিক ক্ষমতা ও মানসিক ক্ষমতা ইত্যাদি বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও সংগ্রামের ফলে অর্জিত হয়।

ইসলাম উপযুক্ত উপায়ে এই ধরণের ব্যক্তি অধিকারে হস্তক্ষেপ করে বিভিন্ন মানুষ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা কমিউনিজমের মত জোরপূর্বক সমস্ত সমস্ত সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার পদ্ধতি গ্রহণ করেনি,যার ফলে ব্যক্তিগত দক্ষতা ও যোগ্যতা অকার্যকর হয়ে পড়ে। এবং সত্য এটাই যে, এই ধরণের পার্থক্য মুছে ফেলা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ শারীরিক শক্তির ব্যবধানকে মুছে কে ফেলতে পারে? মানসিক শক্তির পার্থক্যকে কে মুছে দিতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে নিজের ভাইদের জন্য বলিদান ও আত্মত্যাগের চেতনা জাগ্রত করা যেতে পারে। এর জন্য ইসলাম জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস বর্ণনা করেছে। সেগুলি অনুসরণ করলে ব্যক্তি সামর্থ নষ্ট না করে সমাজে সামগ্রিক সমৃদ্ধির সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উপস্থাপিত ইসলামী সাম্যের বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে এখন আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনীর আলোকে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

মানব সমাজে যারা সাম্য ও সমতার কথা বলে নিঃশ্বাস ফেলেন, তারাও জানেন যে আজকের সমাজেও গরিব ও অসহায়দের এতটাই দুর্বল ও মর্যাদাহীন মনে করা হয় যে তাদেরকে পাশে বসাতে বা তাদের পাশে বসতে কেউ পরোয়া করে না। এমনকি তাদের সঙ্গে চলাফেরা লজ্জা বলে মনে করে। কিন্তু আমাদের নেতা পরোপকারী মানবতার গৌরব ছিল অনন্য। তিনি (সা.) প্রায়ই এই দোয়া করতেন-

"হে আল্লাহ্, আমাকে গরীব বানিয়ে বাঁচিয়ে রেখো এবং একই অবস্থায় গরীবদের জামাতে উঠিয়ে নিও।"

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক গ্রামবাসী যার নাম জাহির ছিল সে দেখতে খুবই সাদামাট ও কুৎসিত ছিল। একদা সে বাজারে তার মাল বিক্রি করছিল আর সে ঘামে ভিজে ছিল। নবী করীম (সা.) পেছন থেকে গিয়ে তার চোখের উপর হাত রাখলেন, হাতের ছোঁয়ায় তিনি অনুমান করলেন ইনি হলেন আমার প্রভু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) । তখন সে আনন্দে ও ভালবাসায় মহানবী (সা.)-এর বরকতময় শরীরে তার পিঠ ঘষতে লাগলো। নবী করীম (সা.) বললেন, আমার এই গোলামকে কে ক্রয় করবে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল, তাহলে আপনি আমার জন্য খুবই মূল্যহীন দাম পাবেন, আমাকে কে কিনবে? তিনি (সা.) বললেন, না, না, আল্লাহর দৃষ্টিতে তুমি মূল্যহীন নও। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে তোমার মূল্য অনেক বেশি।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১)

মহানবী (সা.) গরীব দুঃখীদের দাওয়াতের জন্য জোর দিতেন এবং বলতেন যে, ঐ দাওয়াত খুবই মন্দ যে দাওয়াতে কেবলই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দাওয়াত দেওয়া হয় আর গরীবদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

(বুখারী, কিতাবুল নিকাহ)

হযরত খাদিজা (রা.) এর সহিত যখন তাঁর (সা.) বিবাহ হয়, তখন সেই ধনী মহিলা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এবং দাসদাসী তাঁর (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন। তিনি (সা.) ঐ সকল দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেন আর তাদের মধ্য থেকে একজন মেধাবী ক্রীতাদাসকে মুক্ত করেন এবং তাকে তিনি পালক পুত্র করেন এবং তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ নামে ডাকা হয়। কিন্তু যখন মহান আল্লাহ্ এই রীতি বাতিল করেন এবং ঘোষণা দেন যে, পালক সন্তানদের তাদের পিতার কাছে ফেরত পাঠাও। (সূরা আহযাব, আয়াত: ৫-৬) তাই তাকে আবার যায়েদ বিন হারিসা বলা হয়। কিন্তু তিনি (রা.) তার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে মহানবী (সা.) এর বাড়িতে থাকতে পছন্দ করেন। আর মহানবী (সা.) এই মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের প্রতি আজীবন অপরিসীম ভালবাসা ও মমতাপূর্ণ আচরণ করেছেন।

কেবল এই নয়, মহানবী (সা.) তাঁর সামর্থ্যের কথা মাথায় রেখে তাঁকে বহু সামরিক বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করতে থাকেন এবং হযরত জায়েদ (রা.) এর ইন্তেকালের পর তাঁর যুবক পুত্র উসামাকে এতটাই সম্মান করতেন যে জীবনের শেষ দিনগুলিতে তিনি তাঁর (সা.)-এর তৈরী করা সেনাবাহিনীর কমান্ড অর্পন করেছিলেন। যার মধ্যে মহান সাহাবিরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সুতরাং মানবতার প্রতি শ্রদ্ধার ব্যবহারিক অভিব্যক্তি এবং দক্ষতার ভিত্তিতে পরিষেবা প্রদান করা। এক্ষেত্রে হতে পারে যে তারা প্রতিটি জাতি ও সমাজের দুর্বল ও পশ্চাদপদদের প্রতি কেমন আচরণ করে। এই অর্থে মহানবী (সা.) এর দৃষ্টান্ত উন্নয়নশীল জাতির জন্য পথের দিশারী।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ! মানবতা কেবল মাংস ও পোস্ত দিয়ে তৈরী মূর্তিকে উঁচু স্থানে স্থাপন করে সম্মান বা পুজা করার নাম নয়, মানবতা হল তার হৃদয় ও মনের চিন্তা, আবেগ অনুভূতি, তার আত্মা এবং তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার নাম। যদি এই মূল্যবোধগুলি অনুসরণ করা হয়,তবে বলা যেতে পারে যে, হ্যাঁ তিনি মানবতাকে সম্মান করেছেন। এই অর্থে আমরা যখন আমাদের মনীব ও সর্দার হযরত আকদস মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জীবনী দেখি, তখন এমন অদ্ভুত ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

একজন ব্যক্তি তার বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন এবং একই বিশ্বাস ও ধর্মের লোকদের সঙ্গে সহনশীল আচরণ করলেও অপরিচিত, প্রতিপক্ষ ও শত্রুদের সহিত সে কেমন আচরণ করে তা দেখতে হবে।

একবার মদিনায় এক ইহুদীর জানাযা আসছিল। রসুল করীম (সা.) জানাযার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উঠে দাঁড়ালেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হে রসুলুল্লাহ্! এটি একটি ইহুদীর জানাযা। তিনি (সা.) বললেন, "তাঁর মধ্যে কি প্রাণ ছিল না?সে কি মানুষ ছিল না?"

(বুখারী, কিতাবুল জানায়েয)

হযরত ইয়ালা (রা.) বিন মররাহ বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম (সা.) এর সাথে অনেক সফর করেছি। একবারও এমন হয় নি যে, তিনি (সা.) মানুষের লাশ দেখে কবর দেন নি। তিনি (সা.) কখনও জিজ্ঞাসা করেন নি সে মুসলমান না কি কাফের। সুতরাং বদরের যুদ্ধে ২৪ জন মুশরিককে শত্রু সর্দারকে বদরের ময়দানে একটি গর্তে দাফন করিয়েছিলেন, যাকে কালিবে বদর বলা হয়। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি)

উহুদের যুদ্ধে মক্কার মুশরিকরা রসুলুল্লাহ (সা.) এর চাচা হযরত হামযা (রা.) এর নাক-কান কেটে ফেলেছিল আর এটাই ছিল তাদের রীতি। আহযাবের যুদ্ধে তাদের একজন সর্দার নওফল বিন আব্দুল্লাহ্ মখজুমি নিহত হলে তারা (মুশরিকরা) ভেবেছিল যে মুসলমানেরা এখন আমাদের সর্দারের লাশের সহিত ঐ রকম আচরণ করবে (অর্থাৎ কান-নাক কেটে ফেলবে) । তাই তারা রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট বার্তা প্রেরণ করল যে, আমাদের কাছ থেকে দশ হাজার দিরহম নিয়ে নওফিল এর লাশকে দিয়ে দাও। রসুল করীম (সা.) বললেন আমরা মৃতের মূল্য নিই না। তোমরা তোমাদের লাশ নিয়ে যাও।

(দালায়েলুল নবুয়ত লিল বাইহাকি, ৩য় খণ্ড)

আঁ হযরত (সা.) শত্রু পক্ষের মৃতদেহের অবমাননা করতে নিষেধ করেছেন।

যতদূর নারী ও পুরুষদের মধ্যে সাম্য সম্পর্কিত কথা, দুর্ভাগ্যবশত, আজকের উন্নত যুগে সাম্য ও স্বাধীনতার নামে নারী শোষনের ফলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অন্যথায় ইসলাম কেবল নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয় নি। কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে তাদের অধিকার রক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছে। বাস্তবতা হল ইসলাম নারী ও পুরুষের মাঝে জন্মগত ও শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত পার্থক্যকে অবহেলা করে নি আর করতেও পারে না। তাদের কথা মাথায় রেখেই ইসলাম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। ঘর সামলানো এবং সন্তান লালন পালন করা নারীর দায়িত্ব, অন্যদিকে কঠোর পরিশ্রম করে স্ত্রী ও সন্তানদের যাবতীয় বৈধ প্রয়োজন মেটানো পুরুষের দায়িত্ব।

নারী স্বাধীনতা ও সমতার তথাকথিত অগ্রদূতদের বাস্তব ভূমিকা দেখুন, তারাও নারীদের দিয়ে চাকরী করায় এবং রান্নাঘরের দায়িত্ব পালন ও শিশুদের লালন পালন ও যত্ন নেওয়ার দায়িত্বও নারীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এটা স্বাধীনতা ও সাম্যের নামে নারীর উপর অত্যাচার। ইসলাম এর অনুমতি দেয় না।

ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সুন্দর আচরণের শিক্ষা দিয়েছে এবং সামজে তাদের যে সম্মান দেওয়া হয়েছে তার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দেখা যায় হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পারিবারিক জীবনে।

তাই মাদনী যুগে যখন তাঁর বয়স ৫০ বছর অতিক্রম করেছিল, কেবলমাত্র তরবীয়ত ও জাতীয় প্রয়োজনীয়াতার তাগিদে নবী করীম (সা.) কে বেশ কয়েকটি বিয়ে করতে হয়েছিল এবং একই সময়ে তাঁর তত্ত্বধানে ও তরবীয়তে ৯ জন স্ত্রী ছিল। কিন্তু খুব ভাল ব্যবস্থাপনা ও সম্পূর্ণ সংযত এবং ন্যায়বিচারের সহিত তিনি সকলের অধিকার প্রদান করতেন এবং সকলের যত্ন নিতেন। যদিও তাঁদের পক্ষে বিলাস বহুল আসবাবপত্র দুরে থাক, দুবেলা খাবারের জন্য রুটি জোগাড় করা কঠিন ছিল। তবুও প্রত্যেক স্ত্রী তাঁর সাহচর্যে গর্বিত ছিল। এবং যখন বিজয়ের এবং প্রচুর সম্পদের প্রাচুর্যের সময় আল্লাহর নির্দেশে নবী করীম (সা.) তাঁর স্ত্রীদের কে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও তার সাজসজ্জা কামনা করা তাহলে এসো আমি তোমাদেরকে পার্থিব ধনসম্পদ দান করে নিজের থেকে তোমাদেরকে

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়.....)

কবরে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া প্রসঙ্গে
হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর একটি নির্দেশ এবং এর অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা

সম্প্রতি নাযারাত ইসলাহ ও ইরশাদ রাবোয়ার পক্ষ থেকে আল ফজল ১২ই আগস্ট তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর কবরে ফুল সাজানোর বিষয় নিয়ে একটি ফতোয়া প্রকাশিত হয়েছিল। এই ফতোয়া এমনিতে অসাধারণ, কিন্তু এতে কেবল একটি বিশেষ দিককে দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছিল। কেননা, প্রশ্নকারী কেবল একটি দিক দৃষ্টিপটে রেখে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, যে মৃতের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে কবরে ফুল দেওয়া বৈধ কি না? হযরত খলীফাতুল মসীহ এটিকে বেদাআত বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন আখ্যায়িত করে অবৈধ এবং খিলাফত বিরুদ্ধ বলে আখ্যা দেন। কিন্তু এই ফতোয়ার পরেও বিষয়টির এই দিকটি ব্যাখ্যার দাবি রাখে। আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে না হলেও এমনিতেও কি সৌন্দর্যায়নের উদ্দেশ্যে কবরে ফুল রাখা যায় না? এ প্রসঙ্গে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.)-এর একটি নির্দেশ মনে পড়ে গেল যেখানে তিনি এই বিষয়টির উপরও আলোকপাত করেছেন। এর বিবরণ নিম্নরূপ:

১৯৩৮ সলে যখন (সম্ভবত এটা ৩৮ই সনই ছিল) লন্ডন থেকে মির্যা আযিজ আহমদ সাহেবের পুত্র আযিজ সাঈদ আহমদ মারহুম এর তাবুত এল আর তাঁকে শিশু কবরস্থানে দফন করার প্রক্রিয়া শুরু হল, সেই সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.) জানাযার সাথে কবরস্তানে এসেছিলেন। কবর প্রস্তুত হয়ে গেলে উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি সৌন্দর্যায়ন এবং সম্মানের উদ্দেশে কবরে কিছু ফুল ছড়িয়ে দেওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেন। কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.) তাকে বাধা দিয়ে বলেন (সম্ভবত এই ধরণেরই কিছু বলেছিলেন)

'এটা বৈধ নয়। এভাবে বিদাতের পথ উন্মোচিত হয়।'

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর উপরোক্ত ফতোয়ার সাথে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (আই.)-এর এই ফতোয়াটি মিলে একটি পরিপূর্ণ ফতেয়া তৈরী হয় যার মাধ্যমে এই বিষয় নিয়ে সমস্ত দিক পরিবেষ্টিত হয়েছে। যদিও কবরে ফুল দেওয়া আপাত দৃষ্টিতে একটি নিরীহ কাজ বলে মনে হয়, বরং বাহ্যিকভাবে এর দ্বারা মৃতের জন্য সম্মানও প্রদর্শিত হয়, কিন্তু গভীরভাবে দেখলে মানুষ বুঝতে পারবে যে, এতে দুই ধরণের কদাচার সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশাঙ্কা রয়েছে।

১) প্রথমত এইভাবে ক্রমশ শিরকের পথ উন্মুক্ত হয় এবং শুরুতে সাধারণত সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এর সূচনা হয়ে অবশেষে কবরের অসাধারণ সম্মান এমনকি কবর পুজো পর্যন্ত বিষয়টি গড়িয়ে যায়। যেমন, বর্তমান যুগের লক্ষ লক্ষ মুসলমান কবরে সিজদা করে নিজেদের পরকাল ধ্বংস করে ফেলে। অথচ যে সকল বুজুর্গদের কবরে তারা সিজদা করে, তারা কখনই এই সব পন্থার সমর্থক ছিলেন না আর তাঁরা জানতেন যে, এর পরিণাম শুভ নয়। আমাদের প্রিয় রসুল (সা.) নেশাদ্রব্যের বিষয়ে কি অসাধারণ প্রজ্ঞাপূর্ণ আদেশ দিয়েছেন-

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهٗ فَقَلِيْلُهٗ حَرَامٌ

"অর্থাৎ যে বস্তু অধিক মাত্রায় মাদকতা সৃষ্টি করে তার সামান্য পরিমাণও হারাম বা অবৈধ।"

এই সূক্ষ্ম কথার অন্তর্নিহিত অর্থ, কোন বিষয়ের সূত্রপাত আপাত দৃষ্টিতে সামান্য ও সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন বলে মনে হয়। কিন্তু যেহেতু তার প্রভাব এবং পরিণাম ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে আর মানুষ যেহেতু এক দুর্বল সৃষ্টি এবং কোন ছোট্ট একটি বিষয়ের সূচনা করার পর সেই পথেই এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা তার মধ্যে রয়েছে, তাই শরিয়ত বিধান পরম প্রজ্ঞা দ্বারা আপাত নিরীহ অংশকেও গোঁড়া থেকেই উপড়ে ফেলেছে যাতে মানুষ হোঁচট খাওয়ার যাবতীয় সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পায়।এই কারণে আঁ হযরত (সা.) তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, 'দেখো, আমার মৃত্যুর পর আমার কবরকে যেন সিজদাস্থলে পরিণত করো না।" আঁ হযরত (সা.) জানতেন , তাঁর সাহাবাগণ কখনোই এমনটি করবে না, কিন্তু তিনি ভবিষ্যতের বিপদকে দেখছিলেন।

এই উক্তিতে আরও একটি মনস্তাত্ত্বিক বিষয় রয়েছে। যদি মৃত্যুবরণকারী খোদার কৃপায় পুণ্যবান ও জান্নাতী হয়ে থাকে তবে তার কবরে ফুল দেওয়া নেহাতই এক নিরর্থক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, যে আত্মা জান্নাতে পৌঁছে গিয়েছে আর জান্নাতের অতুলনীয় নেয়ামতরাজি লাভ করেছে কিম্বা সেই পথে বিচরণ করছে, তার জন্য পার্থিব জগতের ফুল কিই বা মূল্য রাখে? আর সে ফুল নিয়ে কিসের আনন্দ পাবে? বরং জান্নাতের ফুলের সামনে সেই ফুলকে নিজের জন্য অসম্মানকর বলে মনে করবে। অপরদিকে, খোদা না করুন, মৃত্যুবরণকারী যদি দোযখী হয় তবে সেই ফুল তার বিন্দুমাত্র উপকারে আসতে পারে না। বরং তার আত্মা (যদি জানতে পারে) মনে করবে আমার প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজন আমাকে নিয়ে উপহাস করছে। আমি দোজখের আগুনে পুড়ে মরছি আর তারা আমার উপর পুষ্প বর্ষণ করছে!!! তাই যে কোন দিক থেকেই দেখা হোক, কবরে ফুল দেওয়া এক প্রকার বিদআত যা কোন উপকারে আসে না। বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকর। কেননা, তা মৃতের জন্য কষ্টের কারণ, অপরদিকে এটা শিরক-এর পথও খুলে দিচ্ছে। এই কারণেই প্রাথমিক যুগে আঁ হযরত (সা.) এর সময় এবং এখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর যুগে কোন মোমেন কখনও এই ধরণের কথা বলে নি।

নিঃসন্দেহে ইসলাম আবশ্যিকভাবে কবরের সম্মান করার আদেশ দিয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কবরের উপর বসা এবং পা রাখা থেকে বিরত থাক এবং যথাসম্ভব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখ। সৌন্দর্যায়ন করা যায়, কিন্তু এটা আবশ্যিকভাবে সম্মান প্রদর্শনের সীমা পর্যন্ত, যাতে মৃতের অসম্মান না হয় আর তাদের আত্মীয়স্বজনদের আবেগ অনুভুতিও আহত না হয়। এর থেকে বেশি কিছু নয়। এর থেকে এগিয়ে যাওয়া বিদাতের অন্তর্ভুক্ত। এতে মৃতের কোন সম্মান হয় না, বরং, যেমনটি আমি পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি, প্রকৃতপক্ষে তাদের

১ম পাতার পর....

দ্বীপসমূহ থেকে দাস ধরে নিয়ে যেত। এমন দাসত্বপ্রথা ইসলামে বৈধ নয়। কেবল যুদ্ধবন্দীদের ধরে নিয়ে আসা বৈধ, আর সেটাও তখনই বৈধ, যখন শত্রুতের সঙ্গে যথারীতি যুদ্ধ হয়। এক্ষেত্রেও নির্দেশ রয়েছে যে, যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ দিয়ে ছেড়ে দাও। আর যদি তার কাছে মুক্তিপণ না থাকে বা তার জাতি তার জন্য মুক্তিপণ দিতে অস্বীকার করে, তবে ইসলামী শাসনব্যবস্থা তাকে অনুগ্রহপূর্বক মুক্তি দিবে। (সূরা মহম্মদ, রুকু ১) আর যদি অনুগ্রহস্বরূপ মুক্তি দেওয়া তার জন্য কঠিন হয় তবে যাকাতের অর্থ থেকে তার জন্য মুক্তিপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে হবে। (সূরা তওবা, রুকু-৮) আর যদি যুদ্ধবন্দী তার প্রভুকে বলে, 'তুমি আমাকে মুক্তি দাও, আমি পরিশ্রম করব আর উপার্জনের অর্থ দিয়ে আপনার মুক্তিপণ পরিশোধ করব। আর সেই সময় পর্যন্ত নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্যের বিষয়ে স্বাধীন হিসেবে গণ্য হব।ইসলামিক দেশে থাকতে সে বাধ্য থাকে। স্বাভাবিকভাবেই যদি কোন মহিলা উপরোক্ত সমস্ত নিয়ম ছাড়াও মুক্ত হতে না চায় তবে সেই মহিলা নিশ্চয় এমন হবে যে নিজের দেশে যাওয়াকে নিজের জন্য বিপদ হিসেবে দেখে আর মুসলমান পুরুষের কাছে থাকার যে বিপদ ছিল, তার পথ খোলা থাকা সত্ত্বেও সেই পথে পা বাড়ানো সে অপছন্দ করে। আর যে মহিলা সমস্ত প্রকারের সুযোগ পেয়েও মুসলমান পরিবার থেকে বের হওয়া অপছন্দ করে, সেই মহিলাকে জোর করে বিয়ে করা ছাড়া মুসলমান পুরুষের কাছে কোন উপায় থাকে না। কেননা সে যদি স্বাধীন না হয় আর মুসলমান পুরুষের সঙ্গে বিয়ে না করে, তবে এলাকায় ব্যাভিচার ছড়াবে আর ইসলাম মোটেই এর অনুমতি দেয় না।

পার্থিব জগতের ফুল কিই বা মূল্য রাখে? আর সে ফুল নিয়ে কিসের আনন্দ পাবে? বরং জান্নাতের ফুলের সামনে সেই ফুলকে নিজের জন্য অসম্মানকর বলে মনে করবে। অপরদিকে, খোদা না করুন, মৃত্যুবরণকারী যদি দোযখী হয় তবে সেই ফুল তার বিন্দুমাত্র উপকারে আসতে পারে না। বরং তার আত্মা (যদি জানতে পারে) মনে করবে আমার প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজন আমাকে নিয়ে উপহাস করছে। আমি দোজখের আগুনে পুড়ে মরছি আর তারা আমার উপর পুষ্প বর্ষণ করছে!!! তাই যে কোন দিক থেকেই দেখা হোক, কবরে ফুল দেওয়া এক প্রকার বিদআত যা কোন উপকারে আসে না। বরং এটা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিকর। কেননা, তা মৃতের জন্য কষ্টের কারণ, অপরদিকে এটা শিরক-এর পথও খুলে দিচ্ছে। এই কারণেই প্রাথমিক যুগে আঁ হযরত (সা.) এর সময় এবং এখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর যুগে কোন মোমেন কখনও এই ধরণের কথা বলে নি।

নিঃসন্দেহে ইসলাম আবশ্যিকভাবে কবরের সম্মান করার আদেশ দিয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কবরের উপর বসা এবং পা রাখা থেকে বিরত থাক এবং যথাসম্ভব পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখ। সৌন্দর্যায়ন করা যায়, কিন্তু এটা আবশ্যিকভাবে সম্মান প্রদর্শনের সীমা পর্যন্ত, যাতে মৃতের অসম্মান না হয় আর তাদের আত্মীয়স্বজনদের আবেগ অনুভুতিও আহত না হয়। এর থেকে বেশি কিছু নয়। এর থেকে এগিয়ে যাওয়া বিদাতের অন্তর্ভুক্ত। এতে মৃতের কোন সম্মান হয় না, বরং, যেমনটি আমি পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি, প্রকৃতপক্ষে তাদের মনোপীড়ার কারণ হয়। আর এমন বিদাতের পরিণামও কখনও শুভ হয় না। মৃতের জন্য ক্ষমালাভ, তার পদমর্যাদা উন্নীত করা, সৎ উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য স্বর্গীয় প্রভুর সামনে যাচনা করা, তার সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা ও উন্নতির জন্য খোদার নিকট দোয়া করা এবং নিজের মৃত্যুকে স্মরণ করে নিজের শুভ পরিণামের জন্য দীর্ঘ দোয়া করা- কবর যিয়ারতের এগুলোই উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কবর যিয়ারতের একটি উদ্দেশ্য রাজনীতিকও হয়ে থাকে। বিভিন্ন জাতি তাদের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশেষ বিশেষ নেতাদের কবরকে এমনভাবে তৈরী করে যাতে অন্যান্য জাতির মানুষ সেখানে এসে নিজেদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়ে সেখানে পুষ্পাঞ্জলি দেয়। আর মনে করা হয় যে, এই রীতি জাতিসমূহের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু স্পষ্টতই এই ধরণের যিয়ারতের প্রকৃত উদ্দেশ্য দোয়া থাকে না (বরং দর্শনার্থীদের মধ্যে অনেক মানুষ এমনও থাকে যাদের দোয়ার প্রতি বিশ্বাস থাকে না।) তারা কেবল জাতিগত ও রাজনীতিকভাবে সম্মান এবং পারস্পরিক মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোকেই এর উদ্দেশ্য বলে মনে করে। এমতাবস্থায় জগতের রীতি হল যখন কোন বড় নেতা ভিন্ন কোন দেশে যায় তখন সেই দেশের প্রতিষ্ঠাতা বা অন্য বিশেষ কোন নেতার কবরে গিয়ে পুষ্পাঞ্জলি দেয় এবং চাদর চড়িয়ে আসে। এটা একটা রাজনীতিক সংস্কৃতি যার সঙ্গে এই ধর্মীয় ফতোয়ার কোন সম্পর্ক নেই। ওয়াল্লাহু আলামু।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** Weekly **BADAR** Qadian
কাদিয়ান
Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday, 10 July 2025 Issue No.28

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(খুতবার শেষাংশ, ৬ পাতার পর....)

মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছেন। আমাদের হৃদয় শোকের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত।” এই খ্রিস্টান ব্যক্তি যিনি হাসপাতালের ব্যবস্থাপক তিনি তার সাথে ব্যবস্থাপনা কর্মী ও অন্যান্য সাথীদের নিয়ে রাবওয়াতেও মরহুমের জানাযায় এসেছিলেন।

সোশ্যাল ও প্রিন্ট মিডিয়াও ডাক্তার সাহেবের শাহাদাতের ঘটনা প্রচার করেছে। একজন সহকারী কমিশনার তার পোস্টে লিখেন; কিন্তু এসব ব্যক্তিরা শুধু লিখতেই পারে আর কিছু করার সামর্থ্য রাখে না কেননা মৌলভীদের সামনে দাঁড়ানোর বা তাদের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস নাই। তবুও যাই হোক এটা তার সাহসিকতা, মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার পোস্টে লিখেছেন, “শেখ মাহমুদ গরীবদের জন্য ত্রাণকর্তার চেয়ে কম ছিলেন না। বিদগ্ধ চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ছিলেন। প্রায় সময় উচ্চমূল্যের পরীক্ষাও দরিদ্রদের বিনামূল্যে করে দিতেন। পুরো শহরে সম্ভবত এমন কোন পরিবার নেই যারা ডাক্তার সাহেবের কাছে চিকিৎসা গ্রহণ করেনি।” ইনি অ-আহমদী হওয়া সত্ত্বেও প্রশংসা করছেন। তিনি আরো বলেন, “প্রায়শই বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতেন আর এটি অনেক বড় কাজ। আমার এই উপলব্ধির কারণ এটিও যে আ মি নিজেও একজন চিকিৎসক। ডাক্তার সাহেব যদি অন্য কোথাও অন্য কোন দেশে যেতেন তাহলে অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারতেন আর বিলাসবহুল জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সারগোধায় মানব সেবাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।” তিনি বলেন, “আজ প্রথমবার কোন ব্যক্তির তিরোধানে অশ্রুসিক্ত হয়েছি যার সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না, কেবলমাত্র মনুষ্যত্বের সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্‌র বান্দাদের প্রতি এই ব্যক্তির অনেক অনুগ্রহ ছিল। আপনারা যদি জানতে চান তাঁর অপরাধ কী ছিল? তবে উত্তর হলো তাঁর অপরাধ ছিল তিনি আহমদী।”

আরেকজন ডাক্তার লিখেন, “ডাক্তার সাহেব সারগোধার প্রথম এ.আর.সি.পি.-কারী চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ছিলেন।এতো যোগ্য এবং সিনিয়র চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও, তিনি সারগোধায় সর্বনিম্ন হারে চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন। কেবল বিশ্বাসের ভিন্নতার কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছে। এই দেশে কি কোনো আইন আছে?

একটি বেসরকারি চ্যানেলের একজন উপস্থাপক সাংবাদিক লিখেছেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং নিন্দনীয় ও বর্বরতাপূর্ণ, এই ঘটনার নিন্দা জানানোর মতো কোন ভাষা আমার কাছে নেই।

একজন সাংবাদিক লিখেছেন- যথেষ্ট হয়েছে, পাকিস্তানকে বাঁচাতে হলে চরমপন্থী গোষ্ঠী এবং সংগঠনগুলিকে বন্ধ করতে হবে। মৌলিক মানবাধিকার এবং আহমদীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের কার্যকলাপ রোধ করার জন্য চরমপন্থী সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। কিন্তু তথাকথিত ধর্মীয় ঠিকাদারদের ভয় এতটাই বেশি যে সরকারও অসহায়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিও অসহায় এবং আদালতগুলি আরও বেশি অসহায়।

আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে শীঘ্রই পাকড়াও করুন এবং দেশকে বাঁচানোর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করাআবশ্যক। এখনই তাদের থেকে মুক্তি পাওয়া প্রয়োজন। কারণ এই তথাকথিত ধার্মিকরা, যারা আসলে সন্ত্রাসী, তারা ধর্মের নামে সন্ত্রাসবাদ করছে। এই লোকেরা দেশকে ধ্বংস করতে তৎপর এবং সর্বত্র যারাই তাদের মতের বিরোধী প্রত্যেকের ওপর তারা আক্রমণ করে। যাহোক না কেন, আমাদের আকুতি তো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে এবং আমাদের উচিত তাঁর অধিকার পূর্ণরূপে আদায় করার চেষ্টা করা। আল্লাহ্‌ তা'লা শহিদ মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ধৈর্য্য ও সাহস দান করুন। মরহুমের বৃদ্ধবয়সী মা রয়েছেন। তাঁর দুঃখও আল্লাহ্‌ দূর করুন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সবাইকে তাঁর সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় রাখুন।

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৯ মে, ২০২৫)

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)**

(১০ পাতার শেষাংশ)

আলাদা করে দিই। তখন ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক স্ত্রীই সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর রসুলের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করেন।

পরিবার-পরিজনদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর মহান দয়ার কথা উল্লেখ করে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি (সা.) সাধারণ মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি (সা.) নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। ছাগলের দুধ তিনি নিজেই দুইতেন। জুতো ও বাড়ির জিনিসপত্র নিজেই মেরামত করে নিতেন। গভীর রাতে বাড়ি ফিরলে কাউকে বিরক্ত না করে বা ঘুম থেকে না জাগিয়ে তিনি নিজেই খাবার বা দুধ বের করে খেয়ে নিতেন।

তাই মানবতার সৎ ও নেককার স্ত্রীদের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা পার্থিব আরাম-আয়েশের বিবেচনায় ছিল না। তাঁরা (রা.) তাঁর (সা.) মুখের কথার জন্য ক্ষুধার্ত ছিল, তাঁর সদয় আচরণ নিয়ে গর্বিত ছিল। তাঁর সদ্ব্যবহার সহানুভূতি ও রহমতে কাছে ঋণী ছিল।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ! সেই যুগের প্রেক্ষাপটে মহানবী হযরত মহম্মদ (সা.) তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের প্রতি যে উত্তম আচরণ, উদারতা এবং প্রশংসা সুলভ ব্যবহার দেখিয়েছিলেন তা দেখুন। যখন আরবদের নিকট নারীদের কোন মূল্য ছিল না, বরং পুরুষরা তাদেরকে জুতোর মত ব্যবহার করত এবং একজনকে অপছন্দ হলে পরিবর্তন করে নিত,এমনকি কন্যা সন্তানের জন্মকে অশুভ মনে করা হত। কিছু নিষ্ঠুর পিতা তাদের কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিত। নারীদেরকে নিকৃষ্ট ও মুর্খ মনে করা হত,তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা বা তাদের সাথে পরামর্শ করাকে পুরুষের জন্য অপমান বলে মনে করা হত। কিন্তু মহানবী (সা.)এই শ্রেণীর নারীদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিলেন,এই উন্নত যুগেও যখন সর্বত্র নারী স্বাধীনতা ও সাম্যের স্লোগান উঠছে, তখনও এর উদাহরণ পাওয়া কঠিন।

সুতরাং মানবতাবাদী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) জীবনের শেষ হজ্জে যে খুতবা দিয়েছিলেন তা মানবতার মাথা উঁচু করে এবং সুউচ্চ পতাকা যা কিয়ামত পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উড়তে থাকবে এবং মানবজাতিকে মানবতার শিক্ষা দিতে থাকবে।

রসুল করীম (সা.) এর প্রেমিক আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ ও মাহদীয়ে মাউদ (আ.) বলেন-

“যদি আল্লাহকে পেতে চাও, তাহলে গরীবের অন্তরে সন্ধান কর। সেই জন্য নবীগণ গরীবদের পোশাক পরিধান করেছিলেন। একইভাবে বড় জাতির মানুষের উচিত নয় ছোট জাতির উপহাস করা। এবং কেউ যেন না বলে যে তার বংশ উচ্চ। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন,যখন তুমি আমার কাছে আস,আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করব না তোমার জাতি কি? বরং প্রশ্ন হবে তোমার কর্ম কি? একইভাবে আল্লাহর নবী (সা.) তাঁর কন্যাকে বললেন, হে ফাতেমা! সর্বশক্তিমান খোদা তোমার বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করবেন না। তুমি যদি খারাপ কিছু করে থাক, তবে মহান আল্লাহ্‌ তোমাকে রসুলের কন্যা বলে ক্ষমা করবেন না। ”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭০)

তিনি আরও বলেন- “আমি চাই না যে আমার জামাতের সদস্যরা একে অপরকে ছোট বড় মনে করুক বা একে অপরকে নিয়ে গর্ব করুক বা একে অপরকে ছোট করে দেখুক।... কে বড় কে ছোট আল্লাহই জানেন....... কিছু লোক বড়দের সঙ্গে খুব ভদ্রতাপূর্ণ আচরণ করে, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সেই যে গরীবদের কথা শোনে, তার প্রতি অনুগ্রহ করে, তার কথাকে সম্মান করে। এমন কিছু কথা মুখে আনবে না যা তাকে কষ্ট দেয়। আপন ভাইদেরকে তুচ্ছ মনে করবে না, যখন সকলে একই ঝর্ণার পানি পান কর, কে জানে কার ভাগ্যে বেশি পানি পান করার আছে। জাগতিক নীতি দ্বারা কেউ মহৎ ও সম্মানিত হতে পারে না। খোদা তা'লার নিকট সেই ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যে বেশি ধার্মিক।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقٰكُمْ ؕ إِنَّ
اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২-২৩)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.) ১৭ই ডিসেম্বর, ২০০৪ সালে জুমআর খুতবাতে জীবনী বিষয়ক বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন-

“এই নিদর্শনগুলি কখনও পুরোনো হতে পারে না বরং আজও যদি আমরা আল্লাহ্‌ তা'লার রহমত অন্বেষন করতে চাই এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই এবং রসুলে করীম (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার দাবিকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এই আদর্শগুলো অনুসরণ করতে হবে।”

আজ প্রত্যেক আহমদীর জন্য মুসলমানদের তুলনায় বড় দায়িত্ব হল তাদের আশপাশের দুর্বল ও অসহায়দের খোঁজ করা ও তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা এবং নবী প্রেমের দাবীকে সত্য প্রমাণ করে দেখানো। আল্লাহ্‌ তা'লা এর তৌফিক দান করুন।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir